পঞ্চম অধ্যায়

শরৎচন্দ্রের উপন্যাস ও ছোটগল্পে বৈষ্ণবীয় ভাবধারার প্রতিরূপ অন্বেষণ

বাংলা কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রপরবর্তী যুগে সর্বব্যাপক জনপ্রিয়তার অধিকারী লেখক হলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি তাঁর সমগ্র সাহিত্য জীবনে কেবলমাত্র সামাজিক প্রেক্ষাপটে মানবচরিত্র ও মানব হৃদয়ের অতল গহনে প্রবেশ করে তার সুচারু বিশ্লেষণেই অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনিই সর্বপ্রথম বাংলা সাহিত্যে অতি আধুনিক সময়লগ্নে দাঁড়িয়ে সাহিত্য চিন্তায় এমন কতগুলি মৌলিকত্ব আনয়ন করতে সক্ষম হয়েছিলেন, যা আগামী দিনের সাহিত্যিকদের সাহিত্য লক্ষ্য নির্মাণে দৃষ্টিপথ খুলে দিয়েছিল। নিষিদ্ধ পল্লী থেকে শুরু করে সমাজবহির্ভূত প্রেমের আঙিনায়, সামাজিক রীতি-নীতির জটিল আবর্তে, নরনারীর নির্ভীক সম্পর্কের আপ্তবাক্য উচ্চারণ, সহানুভূতি, সমবেদনায় তিনি যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, তা বাংলা সাহিত্যকে এক মুহূর্তে কয়েক ধাপ এগিয়ে দিয়ে ইউরোপীয় সাহিত্যের সমগোত্রীয় ভাবে উপস্থাপিত করেছে, বাংলা সাহিত্যের গতানুগতিক শুষ্ক মরুপ্রান্তরের পদযাত্রায় শরৎচন্দ্রীয় কথাসাহিত্যের স্রোত অভূতপর্ব গতিময়তা দান করে তাতে সঞ্চারিত করেছে অভিনব প্রাণবিন্দু। ব্যর্থ প্রণয়ের অন্তর্দহনের ঊর্দ্ধে তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্পে পারিবারিক মনস্তত্ত্বই চিরন্তন মাহাত্ম্য অর্জন করেছে। বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্যকে স্বীকৃতি দিয়েই তিনি অনন্য মৌলিকত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন এ কথা অনস্বীকার্য। মোট বাইশ বছরের সাহিত্য জীবনে তিরিশটি উপন্যাস ও একাধিক গল্পের মধ্য দিয়ে সাধারণ পাঠককে নিজের দিকে মোহিত করে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। দীর্ঘদিন বাংলা সাহিত্যের সাধনায় যে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন, সেই জনপ্রিয়তার ঢেউ বর্তমান সময়েও সমান ভাবে বিদ্যমান। সাহিত্য সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর' গ্রন্থে স্পষ্ট জানিয়েছিলেন যে কোনো উপন্যাস যদি গভীরভাবে শরৎচন্দ্রকে প্রভাবিত করে থাকে তা হল 'চোখের বালি'। তিনি আরো জানিয়েছেন যে—

বাংলা উপন্যাসের তিনটি ধারা

রবীন্দ্র সাহিত্যের রোমান্টিক আবহ। সৌরিন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায়, মনীন্দ্রলাল বসু প্রমুখেরা অনুসরণকারী।	রবীন্দ্র উপন্যাসের ব্যক্তি-কেন্দ্রিক মানসিক প্রেক্ষিত। নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রমুখ ব্যক্তি প্রভাবিত।	পাঠকের চাহিদা নিবৃত্তি। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, নরেশচন্দ্র, উপেন্দ্রনাথের রচনা এই পর্যায়ভুক্ত।

অর্থাৎ বাংলা উপন্যাস এই তিনটি আবর্তে চলমান ছিল। মধ্যবিত্তের সংকট হতাশা থেকে জন্ম নেওয়া বিদ্রোহাত্মক মনোভাব বাংলা সাহিত্যে পাঠকের চিত্ত নিবৃত্তি করে আসছিল। এই সময় রবীন্দ্রনাথ 'গোরা' উপন্যাস থেকে 'চতুরঙ্গ' রচনায় হাত দেবেন, ঠিক সেই মাহেন্দ্রক্ষণে এলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বড়দিদি'-র মত পরিপূর্ণ নারীকেন্দ্রিক বড়গল্প নিয়ে যা পরবর্তীকালে শরৎচন্দ্রের প্রথম উপন্যাসের মর্যাদা পায়। বাংলা উপন্যাসের যে বিপুল বিস্তৃত পটভূমিতে রবীন্দ্রনাথের মতো জ্যোতিষ্ক বিদ্যমান, সেখানে শরৎচন্দ্রের মতো একজন নবাগত লেখকের জনপ্রিয়তার মূল কারণই হল মানুষের প্রতি গভীর ভালোবাসার নৈতিক ভিত্তির উপর অত্যন্ত সহজ, সরল ও নির্লিপ্ত ভঙ্গিমায় সহানুভূতি, কল্পনা এবং মননশীলতা এই তিনটির পরিপূর্ণ সংমিশ্রণ ঘটেছে বলেই শরৎ-সাহিত্যের বিস্তৃত পটভূমিতে এসবের পূর্ণব্যাপ্তি সম্ভব হয়েছে ।

প্রকৃতপক্ষে বৈষ্ণব পদাবলী প্রেমের সাহিত্য, প্রেম মানসী রূপে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকেই তাঁর আরাধ্য দেবতা মনে করেন। শ্রীরাধার এই আর্তি নিয়েই বৈষ্ণব কবিদের রচনায় শ্রীরাধার মনোবেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষাকেই তারা অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁদের লেখনীতে শ্রীরাধা যৌবনোচ্ছল নায়িকা রূপে, কখনো গৈরিক বসনে, ধূসর গোধূলীর একরাশ আবেগ দরদী বেদনাজাত, তীব্র সামাজিক সংকটের কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড়িয়ে মানসী প্রতিমা রূপে অঙ্কিত হয়েছে। শরৎচন্দ্রের সাহিত্যেও তার সক্রিয় প্রভাব যথেষ্ট রূপে বিদ্যমান। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের পর তাই তার জোয়ার শরৎসাহিত্যে এক গভীর স্রোতধারার ন্যায় বাহিত হয়। তাঁর ব্যক্তিগত সংগৃহীত তথ্য থেকে জানা যায়— তাদের বংশে আটপুরুষ ধরে একজন করে সন্ন্যাসী হয়ে আসছে। তাঁর মেজো ভাই ছিলেন সন্ন্যাসী। তিনিও চার থেকে পাঁচ বার সন্ন্যাসী হয়ে ঘুরে বেড়িয়ে এই সাধনার অর্থ অনুধাবন করতে পারেননি। রমাকান্ত চক্রবর্তী 'শরৎসাহিত্যে ধর্ম'-গ্রন্থের একটি তথ্য থেকে জানা যায় যে, রেঙ্গুনে কর্মসূত্রে অবস্থান কালে তিনি বৈষ্ণবভাবাপন্ন হয়েছিলেন। তখন তিনি 'চৈতন্যচরিতামৃত' এবং অন্যান্য বৈষ্ণবগ্রন্থ প্রতিদিন পাঠ করতেন। তুলসীর মালা পর্যন্ত ধারণ করেছিলেন তিনি। সন্ধ্যা-আহ্নিক না করে কারোর হাতে জল স্পর্শ পর্যন্ত করতেন না।

অর্থাৎ শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে বৈষ্ণবীয় প্রেক্ষাপট উদ্ভবের কারণ হিসেবে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের বৈষ্ণবীয় চর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা যে বিদ্যমান একথা বড়ই সংগত। পদাবলী কীর্তনের মধুর রসাত্মক ভঙ্গিমা, গৌড়ীয় বৈষ্ণব পদাবলীর অপাংক্তেয় সাধারণ বৈরাগী বৈষ্ণবী তাঁর সাহিত্যে এই ভাবনার বাস্তবায়নের পশ্চাতে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে বলেই স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। এই বৈষ্ণবীয় দৃষ্টিকোণের স্পষ্ট ছায়ায় তাঁর রচিত উপন্যাস ও ছোটগল্পে তাই

বৈষ্ণবীয় চেতনা অত্যন্ত সচেতন ভাবেই রেখাপাত করেছে। 'বড়দিদি' (১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দ), 'বিরাজ বৌ' (১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ), 'পণ্ডিতমশাই' (১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ), 'শ্রীকান্ত'-প্রথম পর্ব (১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দ), 'শ্রীকান্ত'-দ্বিতীয় পর্ব (১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দ), 'নববিধান' (১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দ), 'শ্রীকান্ত'-তৃতীয় পর্ব (১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দ), 'শ্রীকান্ত'-চতুর্থ পর্ব (১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দ) প্রভৃতি উপন্যাস সহ ছোটগল্প সমূহের মধ্যে 'মন্দির' (১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দ), 'রামের সুমতি' (১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ), 'বিন্দুর ছেলে' (১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ), 'পথনির্দেশ' (১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ), 'মেজদিদি' (১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দ), 'আঁধারে আলো' (১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দ), 'স্বামী' (১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দ), 'একাদশী বৈরাগী' (১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দ), 'মামলার ফল' (১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ), 'অভাগীর স্বর্গ' (১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দ), 'সতী' (১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দ), 'পরেশ' (১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দ) অন্যতম।

উক্ত উপন্যাস ও গল্পসমূহে শরৎচন্দ্রীয় গল্প ভাবনায় বৈষ্ণবীয় ভাব তন্ময়তার বহুদিক আভাষিত হতে দেখা যায়। মূলত তিনি একজন দার্শনিক সত্তার মানুষ হয়ে অতীন্দ্রিয় ভাবরসে বিচরণকারী ছিলেন। শ্রীরাধার দুই চক্ষু মুদিত যে প্রেমবন্যা সকল জগৎকে উতলা করে সেই পথেই ঘনশ্যামের যাত্রা, আর তার সঙ্গেই এগিয়ে চলেন সকল সহৃদয় ভক্ত সমাজ। শরৎচন্দ্র তাঁর উপন্যাস এই অপার মাধুর্যময় রূপাঙ্গিকে নির্মাণ করেছেন। যে পথের উত্তরসূরী শুধু ঘনশ্যাম নয়, স্বয়ং পাঠকের অনুসন্ধিৎসু হৃদয়ও বটে— এই চৈতন্যের অনুসন্ধানই বর্তমান অধ্যায়ের মূল অনুসন্ধিৎসু বিষয়।

বৈষ্ণব তত্ত্ব-দর্শনগত প্রেক্ষাপটে অনুপ্রবেশ করছি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নির্বাচিত উপন্যাস সমূহের অভ্যন্তরে। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালচক্রে বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মত জীবন সম্পৃক্ত দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় নিঃসন্দেহে একটি অন্যতম প্রতিভার পরিচায়ক। তিনি মনুষ্য হৃদয়জাত সংবেদনশীলতা, ব্যাপক জীবন জিজ্ঞাসা, প্রখর দৃষ্টির শৈল্পিক মিশ্রণে, এমন এক সহজ সরল ভঙ্গিমায় গভীর বিষয়কে জীবন্তরূপে উপস্থাপন করেছেন যা বাংলা সাহিত্যে এক বিশেষ যুগ পরিবর্তনের সীমারেখাকে সুনিশ্চিত করে। বাংলা কথাসাহিত্যের দীর্ঘ যাত্রাপথে তিনি সংবেদশীল জীবন জিজ্ঞাসা ও প্রখর পর্যবেক্ষণ শক্তির মহিমায় প্রসারিত এমন এক বৈচিত্র্য আনয়ন করেছিলেন যা পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্য সহজ সরল ভাষায় মনুষ্য হৃদয়ের অব্যক্ত যন্ত্রণাকে উন্মোচিত করতে পেরেছে।

এই তিনটি প্রবাহেই শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্য জীবনকে প্রতিপাদ্য করেছেন। জটিলতর আবেদনে, বিশেষত নারীকেন্দ্রিক মনস্তত্ত্বকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে তাকে পারিবারিক, সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক নানা বিভাজনে বিভাজিত করে সংযোগ করেছেন সুগভীর আর্তধ্বনি। মধ্যবিত্ত শ্রেণির সম্পর্কের ভাঙন, তা থেকে মুক্তি, সুখ, দুঃখ, হতাশা, আনন্দ, বেদনা এ সকল লেখচিত্রকে তিনি কখনো মিলনে কখনো বিচ্ছেদের মহিমায় মহিমান্বিত করে দরদপূর্ণ আখ্যান রচনা করেছেন। সামাজিক শাসন, শোষণ, কুসংস্কার, নিষ্ঠুরতা, নিয়তির নির্মম পরিহাস প্রভৃতি জীবনালেখ্য রচনার বিষয়কে তাঁর সুনিপুণ লেখনীর স্পর্শে অভিব্যঞ্জিত করেছেন। সেই সঙ্গে তাঁর রচিত বিভিন্ন উপন্যাসে তিনি সনাতন বৈষ্ণব ভাবনার মেলবন্ধনে কাহিনী ও চরিত্রকে অপূর্ব গতিময়তা দান করে তাকে পৌঁছে দিয়েছেন মানবিক পরিসরে।

বড়দিদি (১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দ):

উপন্যাসটি ১৯১৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। রচনাকাল সংক্রান্ত প্রাথমিক তথ্য থেকে জানা যায় ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ ১৩১৪ বঙ্গাব্দে সরলাদেবী সম্পাদিত 'ভারতী' পত্রিকায় বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় সংখ্যায় তিনটি ভাগে প্রকাশিত হয়। প্রথম দুটি সংখ্যায় লেখকের নাম উল্লিখিত হয়নি। আষাঢ় সংখ্যায় লেখক রূপে শরৎচন্দ্রের নাম প্রকাশ করা হয়। ১৯০৭খ্রীষ্টাব্দে (১৩১৪ বঙ্গাব্দ) 'ভারতী'তে যখন রচনাটি প্রকাশিত হয়, তখন তিনি বার্মার রেঙ্গুনে বসবাস করতেন। পত্রিকায় লেখাটি প্রকাশের যাবতীয় দায়িত্ব পালন করেন তাঁর বাল্যবন্ধু সৌরীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায়। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে 'যমুনা' পত্রিকার সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পাল শরৎচন্দ্রের নিষেধ সত্ত্বেও এই উপন্যাসটি পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। 'বড়দিদি' শরৎচন্দ্রের একটি হৃদয়স্পর্শী উপন্যাস। অনেকেই একে বড় গল্প রূপেও চিহ্নিত করেছেন। উপন্যাসের নায়িকা যুবতী হওয়ার পূর্বেই বাল্যবিধবা হন। জমিদারী প্রথা ও ধনতন্ত্রের দ্বান্দ্বিকতায় এক ব্যাপক আলোড়িত অংশকে ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন। সুরেন্দ্রনাথ জমিদার সন্তান হলেও জীবন সম্পর্কে বড়ই উদাসীন, গৃহশিক্ষকরূপে তার মাধুরীর সঙ্গে পরিচয় হয়, ক্রমে জীবন প্রবাহের অন্তরঙ্গ জটিলতায় তাদের সাক্ষাৎ ও উপস্থিতি কাহিনীর গতিধারাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। তবে তাদের মানবিক সম্পর্ক পরিপূর্ণ প্রেমের গতিধারায় নিয়ন্ত্রিত হয়নি ঠিকই কিন্তু সুরেনের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে নারীর আজন্ম বৈধব্যের সংস্কারকে সে স্বীকৃতি দেয়। উপন্যাসে বৈষ্ণবীয় তত্ত্ব-দর্শনগত চেতনায় অগ্রসরের পূর্বে সংক্ষিপ্ত কাহিনী বয়নে দৃষ্টিপাত করলে বৈধব্য নিষিদ্ধ প্রেম ও জমিদারতন্ত্রের স্বৈরাচারী রূপটিই অধিক প্রতিভাত হয়। উপন্যাসে মাধবীর তিন বছরের দাম্পত্য জীবনে নেমে আসা অকাল বৈধব্যে মাত্র ষোল বছর

বয়সেই তাকে পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ করে দেয়। একদিকে তার অপরিতৃপ্ত দাম্পত্য সুখ, অন্যদিকে গৃহশিক্ষক সুরেনের প্রতি আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও ভালোবাসার অভাব এই দুটি বিষয়ই তাকে বৈরাগ্য যন্ত্রণায় পতিত করে। এই মানবিক আকুলতার বহুকৌণিক পটভূমিতে আপন ধর্মের মাধুর্যে বাহিত হয়েছে বৈষ্ণবীয় ভাব তন্ময়তা। জীবনের প্রতি চলমান বৈরাগ্য সুরেনের মত চরিত্রকে অনেকটা সাধকের পর্যায়ে উন্নীত করেছে। সুরেনের ঔদাসীন্যের সঙ্গে কাহিনীর প্রথমেই পরিচিত হই—

''এ পৃথিবীতে এক সম্প্রদায়ের লোক আছে, তাহারা যেন খড়ের আগুন। দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেও পারে, আবার খপ্ করিয়া নিবিয়া যাইতেও পারে। তাহাদিগের পিছনে সদাসর্বদা একজন লোক থাকা প্রয়োজন— সে যেন আবশ্যক অনুসারে খড় যোগাইয়া দেয়।''[১]

তাই এই ভাবানুকূলতার সঙ্গে একপ্রকার জাগতিক মায়া পরিত্যাগকারী পুরুষের মায়াময় রূপ প্রথম থেকেই অনুমান করা যায়। তার এই ঔদাসিন্যের পিছনে জীবনের লক্ষ্যহীন অনন্ত হৃদয়হীন স্নেহাকুলতার অভাববোধ কাজ করেছে। এই মনোভাবের পিছনে প্রিয়তমার বিহন জনিত কারণ তার অবচেতন স্তরে গভীর প্রভাব রেখে যায় বলেই আমরা আশান্বিত।

''সুরেন্দ্রনাথ নিতান্ত অন্যমনস্ক প্রকৃতির লোক। প্রাতঃকালে চা ঠাণ্ডা হইয়া যায়, সে হয়ত খায় না।''[২]

''কোন খাদ্য দ্রব্যই যে তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে না, কিছুই যেন তৃপ্তি পূর্বক আহার করে না— কোনটির উপরই স্পৃহা নাই, এই বৃদ্ধের মত বৈরাগ্য, অথচ বালকের ন্যায় সরলতা, পাগলের মত উপেক্ষা, খাইতে দিলে খায়, না দিলে খায় না— এ সকল তাহার নিকট বড় রহস্যময় বোধ হইত।''[৩]

সুরেনের এই অনুভূতি, এই বৈরাগ্য ধর্মই যেন বৈষ্ণবীয় আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে অনেকাংশে তুলনীয় হয়ে উঠেছে। এ বৈরাগ্য যেন প্রাণ প্রিয়ার স্নেহধন্যতার অভাবজনিত কারণে গড়ে ওঠা অব্যক্ত যন্ত্রণার নামান্তর।

এদিকে বড়দিদি ওরফে মাধবীর হৃদয়ে সুরেনের প্রতি এক প্রচ্ছন্ন মায়াবোধ কাজ করতে থাকে। সে অকালবৈধব্যের জীবন নিয়ে পিতৃগৃহে আগমন করে, সকল দায়িত্ব সহকারে সাংসারিক পরিপূর্ণতার পরিচয় দিলেও মনের মানুষের চিরন্তন অপেক্ষা তার অতৃপ্ত যৌবন বেদনার বহ্নিমান জ্বালাকে ক্রমশ প্রজ্জ্বলিত করতে থাকে। সুরেনের মধ্যে সে সেই প্রাণপুরুষের প্রতিচ্ছবি প্রতিবিম্বিত হতে অনুভব করেন। তার সাধিকা জীবনের এই অনুভব ঠিক যেন শ্রীরাধার পূর্বরাগের সমগোত্রীয়

বলে তুলনীয় হয়। কিন্তু সুরেনের অন্যমনস্কতায় সে কাশীযাত্রার মত বৃহৎ বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সংসার পরিত্যক্তা হন। কিছুদিন পর ফিরে আসলে সুরেন ও মাধবী একে অপরের অনুপস্থিতি জনিত বিচ্ছেদ বেদনায় পরস্পর পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হন। তাদের হৃদয় গভীরতা বৃদ্ধি পায়। ইতিমধ্যে সুরেনের গাড়ি দুর্ঘটনায় বিধবা মাধবীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গে শিহরণ সৃষ্টি করে, মাধবীর পিতা ব্রজবাবু তাকে সুরেনের সকল সংবাদ দিলেও মাধবীর দুশ্চিন্তা কোন ভাবেই মুক্তির পথ খুঁজে পায় না। সুরেন সুস্থ হয়ে তার পিতৃগৃহে ফিরে গেলে বড়দিদি মাধবীর বিরহযন্ত্রণা তাকে অন্তরে অন্তরে দগ্ধ করতে থাকে। মনোরমার রসিকতা এবং সুরেনের বিচ্ছেদে সে আহত হয়। এদিকে সুরেনের হৃদয়ে মাধবীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা ভয়, তার আজন্ম ধারণা সহ সকল সমীকরণকে নিমেষেই বিধ্বস্ত করে দেয়। এভাবেই তাদের পূর্ণযৌবনে, বোহেমিয়ান জীবনে প্রেমময় দ্বন্দ্বচিত্রে, সামাজিক সংস্কার জনিত মিলন বাধা বৈষ্ণব পদসাহিত্যের পরকীয়াতত্ত্বগত আঙিনাকে স্পর্শ করে প্রবল বিরহ স্নেহে উভয়কেই সন্দিহান করে দেয় যা বিদ্যাপতির ভাষায়—

''অঙ্কুর তপন তাপে যদি জারব
কি করব বারিদ মেহে।
এ নব যৌবন বিরহে গোঙায়ব
কি করব সোপিয়া-লেহে।।''[৪]

এর অর্থ অঙ্কুর রৌদ্রতাপে দগ্ধ হলে জলভরা মেঘের যেমন প্রয়োজন হয় না, তেমনি যৌবনে নরনারী বিরহানলে দগ্ধ হলে প্রিয় মিলনের অর্থ মূল্যহীন বলে বিবেচিত হয়। সুরেন ও মাধবীর জীবনে বৈরাগ্য সাধনের ফলে যে দুরত্ব তৈরি হয় তা তাদের অন্তরানুভূতিকে যেন প্রতিনিয়ত ভস্মীভূত করেছে। কিন্তু অদৃশ্য সংস্কারের বেড়াজালে তারা মিলিত হতে পারেনি। তাদের এই লোকচক্ষুর দুরত্ব অন্তরের ব্যথাকে আরো ঘনীভূত করেছে। কিন্তু সুরেন্দ্র তখনো অন্যমনস্ক ও আত্মনির্ভরশীল গণ্ডীকে অতিক্রম করতে পারেননি। ইতিমধ্যেই সুরেন্দ্রর বিবাহ হয় ও পাঁচ বছর কাহিনীকাল এগিয়ে যায়। তার স্ত্রী শান্তি তাঁকে দেবতা জ্ঞানে ইহকাল পরকালের সঙ্গী রূপে শ্রদ্ধা করেন। কিছুদিন পরই সে অসুস্থ হন।

এদিকে কলকাতার বাড়িতে ব্রজবাবুর স্থানে শিবচন্দ্র কর্তা হলেন। মাধবীর পরিবর্তে নতুন বধূ এখন গৃহিণী, মাধবী সে সংসারের প্রতি কোনো আন্তরিক তাগিদ আর অনুভব করেন না। তিনি এখন বড়দিদি বলেই বাড়িতে পরিচিতি পেয়েছেন। যে পিতার স্নেহে সে সংসারের সর্বময়ী কর্ত্রী ছিলেন, তিনি এখন ভাইয়ের পরিবারে আত্মীয় কুটুম্বের দলে পড়েছেন। সে কারণে হৃদয়ের

অভিমানে সে সংসারে একপ্রকার অবাঞ্ছিত অনুভবে অন্যতর সাধনার জীবনকে বেছে নিতে চান। তিনি কাশী যাত্রা করলেন ঠিকই কিন্তু নিজেকে সম্পত্তিগত রোষানলে প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত করে ফেলেন, এভাবেই ঘটনাচক্রে দীর্ঘ বছরের ব্যবধানে পুনরায় তার সুরেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। সম্পত্তির কর্দমাক্ত দ্বন্দ্বজর্জর জাঁতাকলে মাধবী এমনভাবে যুক্ত হয়ে, আপন শ্বশুরালয়ের সম্পত্তিকে নিলামে তুলে সুরেনের সম্মুখে যখন এলেন, তখন সুরেন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। আর এই মৃত্যু যাত্রার মধ্য দিয়েই তারা অনন্ত মিলনে মিলিত হলেন অন্তিমকালে।

''সন্ধ্যার পর উজ্জ্বলদীপালোকে সুরেন্দ্রনাথ মাধবীর মুখের পানে চাহিল। পায়ের কাছে শান্তি বসিয়া আছে, সে যেন শুনিতে না পায়— হাত দিয়া তাই মাধবীর মুখ আপনার মুখের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল, বড়দিদি সেদিনকার কথা মনে পড়ে, যেদিন তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলে। আমি তাই এখন শোধ নিয়েছি, তোমাকেও তাড়িয়ে দিয়েছিলাম, কেমন শোধ হ'ল ত?''[৫]

এভাবেই তারা দুই বিরহী আত্মা একে অপরের কাছে মৃত্যুর অনন্ত যাত্রায় মিলিত হবার বাসনাকে ইঙ্গিতায়িত করে গেলেন। সে কারণেই উপন্যাসের নায়ক নায়িকার প্রতি পাঠকের যে সহৃদয়তা, সে সহানুভূতি বৈষ্ণবীয় পদসাহিত্যের 'প্রেমবিলাস-বিবর্ত'-এর আঙিনাকেই স্পর্শ করে গেছে। কৃষ্ণও তাঁর প্রেম মহিমায় নানা অভাব অনুযোগ, মান, অভিমান, ঈর্ষা, বিরোধ আক্ষেপ সব কিছুর নিবেদিত সমর্পণ করেছেন। ঠিক সেভাবেই সুরেন্দ্রর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তার অন্তিম সংলাপে সেই নিবেদিত বাণীকে আমরা উপলব্ধি করেছি। শ্রীরাধাও নিঃশর্তভাবে প্রভুর কাছে নিজেকে যেভাবে নিবেদিত করেছেন, তার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা, আশঙ্কা, দ্বন্দ্ব ও বেদনাজর্জরতার সন্নিকর্ষ মাধবী/ বড়দিদির মধ্যেও সেই আন্তরিকতা উপলব্ধি হয়েছে। এই ভক্তিতত্ত্বের আত্মসমর্পণে পরিশেষে সুরেনের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মাধবীর প্রতি তার আত্মসমর্পণ অপরূপ শান্ত রসে পরিস্ফুট হয়ে তাদের প্রেমকে বিচ্ছেদের মধ্য দিয়ে শাশ্বত শুদ্ধির পথে কাহিনীকে পরিসমাপ্তির দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন ঔপন্যাসিক যা চণ্ডীদাসের একটি নিবেদনের পদের সঙ্গে সাদৃশ্যমূলক—

''না ঠেলহ ছলে অবলা অখলে
যে হয় উচিত তোর।
ভাবিয়া দেখিনু প্রাণনাথ বিনে
গতি যে নাহিক মোর।।
আঁখির নিমিখে যদি নহি দেখি
তবে সে পরাণে মরি।

চণ্ডীদাস কহে পরশ-রতন

গলায় গাঁথিয়া পরি।।”[৬]

বিরাজ বৌ (১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ):

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিরচিত একটি জনপ্রিয় উপন্যাস ‘বিরাজ বৌ’। ‘ভারতবর্ষ’ পত্রিকায় ১৩২৩ বঙ্গাব্দে পৌষ ও মাঘ সংখ্যায় উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয়। ‘ভারতবর্ষ’ পত্রিকায় ‘বিরাজ বৌ’ প্রকাশের মধ্য দিয়ে শরৎচন্দ্রের প্রথম মৌলিক উপন্যাস রচনার যাত্রা শুরু হয়। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ২রা মে, ১৩২৩-এর বৈশাখ সংখ্যায়। ‘গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স’ থেকে উপন্যাসটি মুদ্রিত হয়।

‘বড়দিদি’-র মতই গল্প রচনার বাসনাতেই শরৎচন্দ্র রচনার সূত্রপাত করলেও পরবর্তীকালে বন্ধু যোগেন্দ্রনাথ সরকারের আন্তরিক অনুগ্রহে এর পরিধি বৃদ্ধি করে উপন্যাস হিসেবে কাহিনীকে নির্মিতি দান করা হয়। শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন প্রবাসকালে উপন্যাসটি রচনা করেন।

কাহিনী সংক্ষেপ থেকে জ্ঞাত হয় যে, এ কাহিনী নীলাম্বর ও পীতাম্বর নামক দুই ভাইয়ের। অগ্রজ নীলাম্বরের স্বেচ্ছাচারিতা ও বুদ্ধির বৈকল্য প্রবণতার কারণে তিনি অর্থ উপার্জনে অক্ষম। নেশায় আসক্ত কিন্তু পরোপকারী প্রকৃতির মানুষ। তার অনুজ পীতাম্বর সাংসারিক মানুষ। পীতাম্বর এই দোলাচলতায় তার পৈতৃক সম্পত্তি ভাগাভাগি করে বাড়ির মধ্যস্থ একটি বড় প্রাচীর তুলে সম্পর্কের ইতি টানতে চাইলেও নীলাম্বরের স্ত্রী বিরাজমোহিনী এতে মনক্ষুণ্ণ হন এবং দুই ভাইয়ের একমাত্র বোন হরিমতির সকল দায়িত্ব গ্রহণ করেন, নীলাম্বর হরিমতিকে ভালো পাত্রের সঙ্গে বিবাহ দেন, পাত্রের বিদেশে পড়াশোনার খরচ জোগাড় করতে তার নাভিশ্বাস উঠে যায়, এমনকি সম্পত্তি বিক্রির পর্যায়ে চলে আসলেও বিরাজমোহিনীর বুদ্ধিমত্তায় তিনি তা রক্ষার্থে সকল প্রাণান্ত প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন। এদিকে গ্রামের জমিদার রাজেন্দ্র কুমারের কুনজরে বিরাজের পরিবারে অশান্তির পরিবেশ ঘনিয়ে আসে। স্বামীর কাছে অপমানিত, লাঞ্ছিত হয়ে সে জমিদারের বজরায় গিয়ে আত্মহত্যা করতে গিয়ে বেঁচে যান। এরপর দীর্ঘ সংগ্রামের পথ অতিক্রম করে বহু বছর পর জীবনের অন্তিমকালে তার তীর্থযাত্রার সঙ্গী রূপে নীলাম্বরের সঙ্গে পুনরায় সাক্ষাৎ হয় এবং স্বামীর কোলেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। এবার উপন্যাসে বৈষ্ণবীয় তত্ত্বগত অনুষঙ্গের অন্বেষণে অগ্রসর হওয়া যাক।

প্রকৃতপক্ষে গল্পে দাম্পত্য জীবনের উদারনৈতিক, মিলনপ্রীতি, ঈর্ষা অভিমানগত বিকারগ্রস্ততা, আকস্মিকতা কাহিনী ও চরিত্রের জটিল আবর্তের সঙ্গে বৈষ্ণবীয় অনুষঙ্গকে ব্যাপ্তি

প্রদান করা হয়েছে। নারী মনস্তত্ত্বের নিখুঁত বয়ানে বিরাজের জীবন যেন স্বামী প্রীতির বন্ধন থেকে শেষ পর্যন্ত ঐশ্বরিক পটভূমিতে মুক্তি লাভ করেছে। আরো একটি বিষয় বিশেষভাবে গুরুত্ব পায়, সেটি হল নামকরণ, যেমন নীলাম্বর, পীতাম্বর, হরিমতি, নারাণ, তুলসী— প্রতিটি চরিত্রের নামে বৈষ্ণবীয় ভাবনার স্পষ্ট প্রতিফলন রয়েছে। গল্পের সূচনাতেই নীলাম্বরের চরিত্রে লক্ষিত হয়—

''হুগলী জেলার সপ্তগ্রামে দুই ভাই নীলাম্বর ও পীতাম্বর চক্রবর্তী বাস করিত। ও অঞ্চলে নীলাম্বরের মত মড়া পোড়াইতে, কীর্ত্তন গাহিতে, খোল বাজাইতে এবং গাঁজা খাইতে কেহ পারিত না। তাহার উন্নত গৌরবর্ণ দেহে অসাধারণ শক্তি ছিল। গ্রামের মধ্যে পরোপকারী বলিয়া তাহার যেমন খ্যাতি ছিল, গোঁয়ার বলিয়া তেমনি একটি অখ্যাতিও ছিল।।''[৭]

উপন্যাসের প্রথম থেকে তার মধ্যে এক অপার কৃষ্ণ ভক্তি ও করুণা ধারার রস প্রবাহিত হয়েছে। কীর্তন সংগীতের মধ্য দিয়ে তিনি ভক্তরূপে ঈশ্বরের চরণে নিজেকে উৎসর্গ করতে চেয়েছেন। তার এই গৌরবর্ণ দেহকান্তি ও কৃষ্ণ উন্মাদনার দৃশ্য নবজাগরণীয় মানবতার প্রতীক চৈতন্যদেবের কথা স্মরণ করিয়েছে। এই বৈষ্ণবীয় ভক্তিভাবনা থেকেই তার চরিত্রের দোষ ত্রুটির ঊর্দ্ধে পরোপকারী সত্তাকেই মহীয়ান করা হয়েছে। নীলাম্বরের এই কৃষ্ণপ্রীতিই তাকে ভক্তপ্রাণ বৈষ্ণবীয় সত্তায় উন্নীত করেছে। এমনকি তাঁর বোন হরিমতির সংলাপের এক অংশে কথিত হয়েছে—

''আচ্ছা দা, বৌদি কেন তোমাকে বোষ্টম ঠাকুর বলে ডাকে? নীলাম্বর তুলসীর মালা দেখাইয়া হাসিয়া বলিল, আমি বোষ্টম বলেই ডাকে। ... তুমি কেন বোষ্টম হবে? তারা তো ভিক্ষে করে। আচ্ছা ভিক্ষে কেন করে দাদা? নেই বলেই করে। ... তাদের পুকুর নেই, বাগান নেই, ধানের গোলা নেই।''[৮]

জীবন সুখের এই ঔদাসীন্য ও ঈশ্বর সেবায় নিয়োজিত প্রাণই বৈষ্ণবধর্মের মূলমন্ত্র। হৃদয় ঔদার্য, জগৎ সম্পর্কে সকল মোহা-আসক্তির ঊর্দ্ধে তাদের আত্মার এক করুণাময় অবস্থানই তাদের জীবন-সুখের মূল মন্ত্রের সন্ধান যেভাবে দিয়েছে, নীলাম্বরও ঠিক যেন সেই ঐশ্বরিক ভক্তির ঊর্দ্ধসীমায় পৌঁছতে চেয়েছেন। সকল সুখের আত্মত্যাগই যেন চিরমুক্তির বাণীকে তার আপন মনে হয়েছে। ঈশ্বর প্রেমে তার আত্মানুগত চিত্তের আরো এক পরিচয় ফুটে ওঠে। তার স্ত্রীর সঙ্গে দাম্পত্য অভিমানের সময়। বিরাজ বলে—

''ভগবানের উপর ভরসা শুধু তোমাদের একচেটে আমাদের নয়। আমরা কীর্ত্তন গাইনে, তুলসীর মালা পরি নে, ...''[৯]

বৈষ্ণবীয় সাধনার মার্গে ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ ও সংসার বিমুখতার মধ্য দিয়েই সে

সকল উপাচারের ঊর্ধ্বে প্রভু কৃষ্ণকেই আরাধ্য দেবতারূপে স্বীকৃতি দিয়েছেন। ভগিনী হরিমতির বিবাহে সর্বস্বান্ত হয়ে যাওয়ার উপক্রম হলেও নীলাম্বর ও বিরাজের দাম্পত্য প্রেমের কোন ঘাটতি হয়নি, তারা পরম আনন্দে ঈশ্বর সেবায় আত্মনিয়োগ করতে চান—

''আমরা দুটো প্রাণী-যেমন করে হোক্ চলে যাবেই। নিতান্ত না চলে, তুমি বোষ্টম ঠাকুর ত আছই, আমি না হয় বোষ্টমী হয়ে পড়ব— দু'জনে কাশী বৃন্দাবন করে বেড়াব... তোমার মুখে কৃষ্ণ নাম শুনে পশু-পক্ষী স্থির হয়ে দাঁড়াবে, ... এমন বোষ্টমকে আর পাঁচজন বোষ্টমীর সামনে প্রাণ ধরে বার করতে পারব না— তার চেয়ে এখানে শুকিয়ে মরি সে ভাল।''[১০]

এভাবেই দুটি নরনারী বোষ্টম বোষ্টমী সেজে জীবনের চরমতম প্রতিকূলতার দিনে সহজিয়া সাধন প্রণালীকে বেছে নিয়ে জীবনের রসদ অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছেন। বৈষ্ণবীয় প্রেক্ষাপটের এ এক প্রত্যক্ষ নিদর্শন রূপে কাহিনীতে প্রেমতত্ত্বকে রসভাষ্য করে তোলা হয়েছে। এমনকি অন্তিমলগ্নে বিরাজ স্বামীর চরণধূলিকে শিরোধার্য করে— ইহ জীবন ত্যাগ করার বাসনাকে পোষণ করেছেন। ইতিমধ্যে স্বামী স্ত্রীর দাম্পত্য কলহে তাদের সংসারে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। তবে এ কলহ যেন সাধারণ মান-অভিমান নয়, বিচ্ছেদের অতল রাগিণীর সুর অনুধাবন করে সে অনুভব করে প্রবল হৃদয়বিদীর্ণ যন্ত্রণা। এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তির পথ তিনি ঈশ্বর ভক্তির পথে অনুসন্ধানের চেষ্টা করেন—

''এই ঘরের দেওয়ালে একটি রাধাকৃষ্ণের পট ঝোলান ছিল, সেইদিকে চাহিয়া চাহিয়া নীলাম্বর হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিল; কিন্তু পাছে কেহ জানিতে পায়, এই ভয়ে তৎক্ষণাৎ চোখ মুছিয়া বাহির হইয়া গেল।''[১১]

বিরাজের বিহনে সে বারবার প্রার্থনা জানায়—

''অন্তর্যামী ঠাকুর, একটিবার মুখ তুলে চাও। যে লোক কোন দোষ, কোন পাপ করতে জানে না, তাকে আর কষ্ট দিও না ঠাকুর—''[১২]

এভাবেই প্রেমরসে তাদের পরিবারে এক বৈষ্ণবীয় পরিমণ্ডল সর্বদাই বিরাজমান ছিল। কিন্তু সাংসারিক দারিদ্র্যের প্রতিনিয়ত নির্মমতা, আত্মাভিমান, দাম্পত্য মান, অভিমান, বাক, বিতণ্ডা, কুৎসা, সন্দেহপরায়ণতা, তাদের সাংসারিক প্রেমের সন্দেহপরায়ণতায় বিরাজ শেষ পর্যন্ত সংসার ত্যাগী হয়। তার সতীত্বের মুহূর্তের সংশয়ান্বিত ঝড় তার চরিত্রে যে লাঞ্ছনার দাগ দিয়ে যায়, তাতে শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরের নিকট বিচার প্রার্থী হন।

উপন্যাসে সুন্দরী চরিত্রটির ক্ষণিক উপস্থিতির মধ্য দিয়েও একটি বৈষ্ণবীয় ভক্তির পরিচয়

প্রকাশিত হয়েছে, সে তীর্থ সম্পন্ন করেছে এবং নীলাম্বরের প্রবল অর্থাভাবের দিনেও মৃদুকণ্ঠে তাকে বলেছে—

''এ তোমারই দেওয়া টাকা বাবু, তীর্থ করব বলে দেবতার নামে তুলে রেখেছিলুম— আর যেতে হ'ল না— দেবতা নিজে ঘরে এসে নিয়ে গেলেন।''[১৩]

এই সামান্য উক্তিই যেন সুন্দরীর হৃদয়ের ভক্তিকে এক নিমেষেই নীলাম্বরের চরণে সমর্পিত করেছে, তারই সাক্ষ্য বহন করে। মানবের মাঝেই যে দেবতার উপস্থিতি সুন্দরীর উক্তি যেন সেই গুঢ়তত্ত্বকেই প্রত্যক্ষত প্রমাণ করেছেন। নীলাম্বর ও বিরাজের দাম্পত্য প্রণয়ের ঘাত প্রতিঘাতের প্রেক্ষাপট, দ্বন্দ্বজর্জর অন্তর্নিহিত হৃদয় থেকে নীলম্বরের অনুভূত হয়—

''হয়ত, শ্যাম নাম শুনিয়া এমনই কোন এক বর্ষায় মেঘাচ্ছন্ন প্রভাতে শ্রীরাধা এমনই ব্যাকুল হইয়া উঠিয়া বসিতেন। সে চোখ মুছিতে মুছিতে বাহিরে আসিয়া দেখিল, উঠানে তুলসী ডাকিতেছে।''[১৪]

বর্ষার মেঘাচ্ছন্ন পটভূমিতে রাধাকৃষ্ণের মিলনাক্ষেপ, বিরহ উন্মাদনার চিত্র যেন নীলাম্বর ও বিরাজের বিবর্তমান কাহিনী ধারার সঙ্গে অঙ্গীভূত হয়ে, প্রিয়া বিরহে নীলম্বরের নয়নকে অশ্রুসিক্ত করেছে। প্রেমের এও যেন এক বিরহ কাতর অনুভূতিকে ঔপন্যাসিক বৈষ্ণবীয় চেতনায় রঞ্জিত করেছেন। পরিশেষে জীর্ণ শীর্ণ দেহে, ভিক্ষাবৃত্তির কঠিন জীবন, সংসার ত্যাগ, জমিদারের কুদৃষ্টি এড়িয়ে, জীবনের শেষ প্রান্তে বিরাজমোহিনীর সঙ্গে তার স্বামী নীলাম্বরের সাক্ষাৎ হয়। তার চরণে স্থানলাভের মধ্য দিয়েই তার ইহজীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। ঔপন্যাসিক আলোচ্য উপন্যাসে তার সহজ সরল কাহিনী বর্ণনা, নাটকীয় জটিলতা, দাম্পত্য সমস্যা, মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েন, দীর্ঘ বিরহ, অতৃপ্তি, বন্ধনমুক্তির আলেখ্যকে খুব সুন্দর ভাবে বৈষ্ণবীয় পরিমণ্ডলকে যুক্ত করে, তত্ত্বগত দিক থেকে এখানে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার অবয়বে নীলাম্বর ও বিরাজের কাহিনীকে যেমন সম্পৃক্ত করতে পেরেছেন, ঠিক তেমনি ঐশ্বরিক সাধনায় নীলাম্বরের কৃষ্ণ আত্মায় সমর্পণ, তার কীর্তন গীত, গৌরকান্তি বর্ণ, অঙ্গসৌষ্ঠব চৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে তুলনীয় করে সেইরূপ ভক্তি ভাবনার চিত্র পরিলক্ষিত হয় এবং সর্বশেষে বোষ্টম, বোষ্টমীর বৈষ্ণব ধর্মের সহজিয়া সাধনপ্রণালীর প্রসঙ্গোল্লেখের মধ্য দিয়ে 'বিরাজ বৌ' উপন্যাসের বহুক্ষেত্রে, বিশেষত চরিত্রের নামকরণে এর প্রত্যক্ষ প্রভাব উঠে আসে। ঔপন্যাসিক নৈতিকতা পদস্খলনের ঊর্দ্ধে দাম্পত্য জীবনের নৈতিক জয়ের সঙ্গে বৈষ্ণবীয় ভাবতন্ময়তাকে সূক্ষ্ম তুলির টানে অঙ্কিত করতে সফলতা অর্জন করেছেন।

পণ্ডিতমশাই (১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ):

'পণ্ডিতমশাই' উপন্যাসটি রচিত হয় ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স থেকে সর্বপ্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় উপন্যাসটি। বাংলা কথাসাহিত্যে শরৎচন্দ্র তাঁর বহুবিধ উপন্যাস রচনার মধ্য দিয়ে এক নতুন পথের পরিধিকে যেমন সম্প্রসারিত করেছেন, তেমনি সংযুক্ত করেছেন এমন অনির্দিষ্ট বৈচিত্র্য, প্রকাশ ভঙ্গির সারল্য, যা সংবেদনশীল পাঠক হৃদয়কে এক ব্যাপক জীবন জিজ্ঞাসা, পর্যবেক্ষণশক্তি, স্বাধীন চেতনসত্তা দান করেছে। ফলে পরবর্তী বাংলা কথাসাহিত্যের গতিপ্রকৃতিই যেন এক নতুন সাহিত্যাঙ্গিক ও সৃজনধারার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে শুরু করে। তাঁর প্রখ্যাত সৃষ্টির আখর 'পণ্ডিত মশাই'-এর মত একটি উপন্যাস প্রকৃতই আলোচনার দাবি রাখে। উপন্যাসে সূচনালগ্ন থেকেই আলোকপাত করেছে বৈষ্ণবীয় পরিমণ্ডলের নিত্য-অনিত্য বহু প্রসঙ্গ।

এ উপন্যাসের মূল চরিত্র কুসুম নামের একটি মেয়ে, সে একদিকে আত্মাভিমানী, অন্যদিকে আপন ব্যক্তিত্বে মহীয়সী এক নারী। আপন ভ্রাতৃত্বের সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কে তিনি অভিভাবক সুলভ পরায়ণতা দেখিয়েছেন। তার স্বামী একজন পণ্ডিত ব্যক্তি হওয়ায় তিনি গ্রামে পণ্ডিতমশাই রূপে পরিচিতি লাভ করেন, শৈশবে পরিত্যাগ করা কুসুমকে সে দ্বিতীয়বারের মত পেতে চাইলেও কাহিনীতে জটিলতার সৃষ্টি হয়। বৃন্দাবন ও কুসুমের বিবাহ, পরস্পরের ঘাত-প্রতিঘাত, পুনর্মিলনের প্রতিবন্ধকতা, নানাবিধ সংস্কার সহ চরিত্রের অতর্কিত আমূল পরিবর্তন উপন্যাসে এক নতুনতর জীবনাদর্শ স্থাপিত করতে সহায়তা করেছে। প্রথম জীবনে কুসুম ও বৃন্দাবনের বিচ্ছেদের পর তার মায়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এক বৈরাগীর সঙ্গে কুসুমের কণ্ঠী বদল হলেও মাস ছয়েক পরই তিনি ইহলোকের মায়া ত্যাগ করেন। উপন্যাসের প্রথমেই উঠে আসে বৈরাগী জীবনের একটি প্রতিচ্ছবি—

''কুসুমের মা দুঃখী হইলেও, অত্যন্ত গর্বিতা ছিল। ... সেই মাসেই আর একজন আসল বৈরাগীর সহিত কন্যার কণ্ঠীবদল-ক্রিয়া সম্পন্ন করে; কিন্তু ছয়মাসের মধ্যেই এই আসল বৈরাগীটি নিত্যধামে গমন করেন।''[১৫]

সময়ে প্রবহমানতায় বৃন্দাবনের দ্বিতীয় স্ত্রীর মৃত্যুর পর পুত্র চরণের মাতৃস্নেহের অভাবজনিত কারণে এমনকি, সাংসারিক প্রয়োজনে নতুন করে সাংসারিক বন্ধনে আবদ্ধ হবার বাসনায় পুনরায় কুসুমকে তার জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য তার দাদা কুঞ্জ বোষ্টমকে পঞ্চাশ টাকা নগদ, পাঁচ জোড়া ধূতি-চাঁদর, কুসুমকে পাঁচভরি সোনা এবং একশ ভরি রূপার অলংকার দিয়ে পুনরায় স্বীকৃতি দিতে চান। কিন্তু কুসুম নারীত্বের অবমাননায় তা গ্রহণ করে না। স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়—

''আসল নকল বুঝিনে দাদা: শুধু বুঝি আমি বিধবা। ... যে, যা-ইচ্ছে হবে, তাই করবে? এই বিয়ে, কণ্ঠীবদল; আবার বিয়ে, আবার কণ্ঠীবদল; যাও, ও-সব আমার সম্মুখে তুল না।''[১৬]

এভাবে নারীত্বের দৃপ্ত ভঙ্গিমায় সে তার আত্মমর্যাদার সঙ্গে কোন ভাবেই আপোশ করতে চাননি। বৃন্দাবন ও কুসুমের অপরিপূর্ণ দাম্পত্যের মাঝে এ যেন কৃষ্ণের অভিমানী রাধার মান ভঞ্জনের চিত্রকে সমৃদ্ধ করেছে। এমনকি দুটি চরিত্রই বৈষ্ণব ভাবাশ্রিত পরিমণ্ডলে লালিত হওয়ায়, এই পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ জ্ঞানদাসের একটি উদ্ধৃতি বিশেষভাবে স্মরণীয়—

''চাহ মুখ তুলি রাই চাহ মুখ তুলি।
পরশিতে চাহি তুয়া চরণের ধূলি।।
পীত পিন্ধন মোর তুয়া অভিলাষে।
পরাণ চমকে যদি ছাড়হ নিশ্বাসে।।
রাই কত পরখসি মোরে আর।
তুয়া আরাধন মোর বিদিত সংসার।।''[১৭]

'মান' ও 'কলহান্তরিতা' পর্যায়ের এ পদটি উপন্যাসে এ অংশের সঙ্গে যথেষ্ট সামঞ্জস্যপূর্ণ। 'মান' ও 'কলহান্তরিতা' পর্যায়ে শ্রীরাধা কৃষ্ণ একে অপরের প্রতি মিলন ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও পরস্পরের কাছে ধরা দিতে পারেন না। কারণ অভিমানী রাধা নিজ বাসনাকে দমন করে নায়ককে আলিঙ্গনে বাধা দিয়েছে, এই মানকে কেন্দ্র করে রাধার মধ্যে শঙ্কা, ক্রোধ, চপলতা, গর্ব, ঈর্ষা, গ্লানি, চিন্তা, নির্বেদ তাদের মধুর প্রেমকে আরো বেশি উপভোগ্য করে তোলে। কলহান্তরিতা পর্যায়ে রাধা সকল মান অবসানের পর্যায়ে উপনীত হয় এবং সে আত্মসমর্পণের পথে নিজেকে প্রস্তুত করে। এই প্রেম পর্যায়ে শ্রীরাধার যেরূপ অভিমানী চিত্তকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, ঠিক তেমনি কুসুমের সঙ্গে বৃন্দাবনের যে মান অভিমানের পালা তা একই ভাবে সমতুল্যতা পেয়েছে। পদ মধ্যে কৃষ্ণ যেমন গভীর গাঢ় সুরে রাধার মানভঞ্জন করতে চাইছেন, রাধা তুমি মুখ তুলে চাও। তোমার পায়ে ধরে মিনতি করছি। রাধার স্পন্দিত নেত্র, হৃদয়ের উচাটন, দীর্ঘশ্বাস তার দীর্ঘ অপেক্ষায় আজ প্রভু কৃষ্ণ বড়ই অনুতপ্ত। আর কত পরীক্ষা দিতে হবে তোমাকে, তোমার আরাধনাই এ সংসারের সর্বত বিদিত। তাই তুমি আমার জীবনে ফিরে এসো। এই ভাবনারই সার্থক প্রতিফলন বৃন্দাবনের কার্যপ্রণালীতে পরিস্ফুট হয়েছে। আরো একটি প্রসঙ্গে বলা যায় কুসুমের সঙ্গে বৈরাগীর যে কণ্ঠীবদল হল তার অর্থ বৈষ্ণব মতে পরস্পরের সঙ্গে তুলসীর মালা বিনিময় করে বিয়ে করা। এর থেকে স্পষ্ট ভাবেই উপন্যাসে বৈষ্ণবীয় নিয়মাচার বিধি বিধানের প্রত্যক্ষ সংযোগকে তুলে ধরা সম্ভবপর

হয়েছে। কিন্তু কুঞ্জকে কুসুম অভিমান বশত বিধবা পরিচয় দিতেও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হননি। নারী স্বাতন্ত্র্যের এই পরিচয়ের মধ্য দিয়েই কাহিনীর পরবর্তী অংশ বিশ্লেষণে অগ্রসর হবো।

কাহিনীর পরবর্তী ধাপে আমরা দেখতে পাই ছোটবেলা থেকেই বৃন্দাবন লেখাপড়ায় বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। এমনকি একটি পাঠশালার সূত্রপাতের পরিকল্পনা করেন। তার পিতা গৌরদাসের মৃত্যুর পর পাড়ার একজন অবসর প্রাপ্ত প্রাচীন শিক্ষকের কাছে ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করেন, পঠন পাঠনের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ বশত সে সমস্ত রাত্রিকাল ব্যাপী অধ্যয়ন করতেন। তার বিধবা জননী তার শিশুপুত্রটির কথা ভেবে তাকে পুনরায় বিবাহের বিষয়ে উৎসাহিত করতেন। এখান থেকেই তার কুসুমের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও পণ্ডিতমশাই রূপে যাত্রাপথের সূত্রপাত হয়। তাদের বিবাহের পর সাময়িক বিচ্ছেদকালে বৃন্দাবনের কথোপকথনে কুসুমের হৃদয় ধীরে ধীরে প্রেমিকা রাধার ন্যায় বিগলিত হতে শুরু করে—

''একবার মনে হল না যে, আজ তুমি এই প্রথম কথা কইলে। যেন কত যুগযুগান্তর আমাকে তুমি এমনি শাসন করে এসেছো— ভগবানের হাতে বাঁধা কি আশ্চর্য বাঁধন, কুসুম... বৃন্দাবন চলিয়া গেলে এই কথা স্মরণ করিয়া তাহার সর্বশরীর শিহরিয়া উঠিল ... তাহাকে সে একদিন অশিক্ষিত চাষা মনে করিয়া গণনার মধ্যেই আনে নাই, আজিকার কথাবার্তা এবং এই কথাবার্তার পর, তাহারই সম্বন্ধে এক নূতন তৃষ্ণায় সে উৎসুক হইয়া উঠিল।''[১৮]

এভাবেই কুসুমের মানভঞ্জন হতে শুরু করে। স্বামী বৃন্দাবনের চারিত্রিক, আন্তরিক ব্যবহারের মুগ্ধতায় সে ধীরে ধীরে স্বামীর প্রতি দৃষ্টি ফেরাতে মনস্থির করতে থাকেন। তাদের উভয়েরই অন্তরে যেন প্রেমের নবতরঙ্গ বীনার ধ্বনি সুমধুর রাগিনীর সৃষ্টি করে। এমনকি বৃন্দাবন ও কুসুমের হাতে সকল দায়িত্ব অর্পণ করে ঘর-সংসার সমর্পণ করে তীর্থ-ধর্ম করার সুখ স্বপ্নের বিভোরতায় নিজেকে তন্ময় করে ফেলেন। কিন্তু এই সম্পর্কের সেতু পথেই কুসুম একদিন বৃন্দাবনের মাতাকে অপমান করে। জীবনের এই নিষ্ঠুর প্রত্যাঘাতে বৃন্দাবন ভাবে—

''যে এমন করিয়া সমস্ত নির্মূল করিয়া দিয়া তাহার উপবাসী, শান্ত, সন্ন্যাসিনী মাকে এমন করিয়া আঘাত করিতে পারিল— সে তাহার স্ত্রী, তাহাকেই সে ভালোবাসে!''[১৯]

এই প্রসঙ্গ থেকে আরো এক বৈষ্ণব ভাবাশ্রিত চরিত্রের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়, তিনি হলেন বৃন্দাবনের মা। যিনি আধ্যাত্মিক শুদ্ধতায় সমগ্র জীবন কৃষ্ণসেবায় নিয়োজিত করেছেন। সেই সাধিকা মায়ের এ হেন অপমান বৃন্দাবনের মনে কুসুমের প্রতি একটি প্রশ্নচিহ্নের জন্ম দেয়। প্রায় বিনা বেতনে বৃন্দাবন পণ্ডিত মশাই রূপে একদিকে তার শিক্ষক সত্তা, অন্যদিকে তার সাধক

বৈষ্ণবীয় সত্তাকে সে অক্ষুণ্ণ রাখে। কুসুমও বৃন্দাবন সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্য থেকে ক্রমশ বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়ে। এমনকি গৃহদেবতাকে ফেলে দাদা কুঞ্জর বিবাহে যাওয়াও তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। একদিন কুঞ্জর শাশুড়ি কুসুমের যে রূপ দেখে মোহিত হন—

''তাহার সিক্ত বসনে যৌবন-শ্রী আঁটিয়া রাখিতে পারিতেছিল না। দেহের তপ্ত কাঞ্চনবর্ণ ভিজা কাপড় ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। আর্দ্র এলোচুলের রাশি সমস্ত পিঠ ব্যাপিয়া জানু স্পর্শ করিয়া ঝুলিতেছিল। বামকক্ষে পূর্ণ কলস, ডান হাতে চরণের বাম হাতধরা।''[২০]

তার এই রূপ ঠিক যেন শ্রীরাধার কাঁচা অঙ্গের বরণ স্বরূপ তুলনীয়, শ্রীরাধার জ্যোতির্ময় রূপবর্ণনায় যেভাবে গোবিন্দ দাস একটি পদে লিখেছেন—

''যাঁহা যাঁহা নিকসয়ে তনু তনু-জ্যোতি।
তাঁহা তাঁহা বিজুরি চমকময় হোতি।।
যাঁহা যাঁহা অরুণ-চরণ চল চলই।
তাঁহা তাঁহা থল-কমল-দল খলই।।''[২১]

অর্থাৎ রাধার রূপ যেভাবে বিদ্যুৎ চমকের ন্যায়, তার অরুণ-বর্ণ পদ যুগল যে দীপ্তি প্রতিভাত করেছে, কুসুমের মোহিনী রূপেও যেন সেই রাধা সম রূপোজ্যোতি বিচ্ছুরিত হয়েছে। গোবিন্দদাসের এই পদে যেভাবে কৃষ্ণ বিমোহিত হয়েছে, সেই রূপ মুগ্ধতা কুঞ্জর শাশুড়ী অনুভব করেছেন। এমন কি অন্তরে আপন মেয়ের জন্য উদ্বিগ্নও হয়েছেন, আর এক প্রকার ঈর্ষাকাতর হয়েই সে কুঞ্জকে প্রশ্ন করে—

''কৈ গা, তোমার গলায় মালা নেই, তেলক সেবা করলে না, কি রকম বোষ্টমের মেয়ে তুমি বাচ্ছা?''[২২]

এসকল অনুষঙ্গ বৈষ্ণবীয় সাধনার অঙ্গ রূপেই সুনির্দিষ্টতার পরিচয় বহন করে। ইতি মধ্যে গ্রামে ওলাওঠার পরিস্থিতি, বহু মানুষ তাদের স্বজন হারানো বেদনায় কাতর, এমন পরিস্থিতিতে বৃন্দাবনের মন অন্তর্বেদনার বড়ই কাতর হয়। সন্তান হারানোর যন্ত্রণা, প্রতিবেশিদের মৃত্যু, পাঠশালার অচলবস্থার বিপর্যয়ের মধ্যেও ঠাকুরঘর ফেলে রেখে যেতে দ্বিধান্বিত বোধ করেন, বৃন্দাবন গ্রাম থেকে বিদায় নেওয়ার পূর্বে কুঞ্জর বাড়ি থেকে জানতে পারে কুসুম পশ্চিম থেকে দাদার শাশুড়ির সঙ্গে তীর্থ করে ফিরেছেন। তাদের কথোপকথনে উভয়ের মান অভিমানের চিত্রটি থেকে স্পষ্ট ফুটে ওঠে যে, বৃন্দাবন ও কুসুমের মিলন সহজ পথে হবার নয়। বৃন্দাবনের সঙ্গে তার বিচ্ছেদ তাকে পুনরায় দুঃখের সমুদ্রে পতিত করে। প্রবল যন্ত্রণার ভার সে সম্মুখে প্রকাশ না করলেও

অন্তরে অন্তরে তার কড়াল দংশন অনুভব করেন। ইতিমধ্যে বৃন্দাবনের মাতার মৃত্যু, তার পুত্র চরণের মৃত্যু বৃন্দাবনকে সর্বস্বান্ত করে দেয়, মাতা ও পুত্রের সহস্র স্মৃতি, জীবনে পণ্ডিতরূপে আত্মপ্রতিষ্ঠার চরম লড়াই করতে করতে কুসুম একদিন তার কাছে নিজেকে উৎসর্গ করতে চায়, কুসুম তার সঙ্গে যেতে চাইলে বৃন্দাবন জানায়—

''কি করে যাবে কুসুম, আমি তোমাকে প্রতিপালন করব কি করে? আমি নিজের জন্য ভিক্ষে করতে পারি, কিন্তু তোমার জন্য ত পারিনে! তাছাড়া তুমি হাঁটবে কি করে? ... কুসুম বলিল, ... আমি যাবই। অবহেলায় ছেলে হারিয়েচি, স্বামী হারাতে আর চাইনে। ... তবে চল, বলিয়া বৃন্দাবন সম্মতি জানাইল এবং আর-একবার কেশবের উপর সমস্ত ভার তুলিয়া দিয়া সেই রাত্রেই স্ত্রীকে সঙ্গে করিয়া বাড়ল ত্যাগ করিয়া গেল।''[২৩]

তাই পরিশেষে এই বক্তব্যই পরিস্ফুট হয় যে বোষ্টম বৃন্দাবন ও বোষ্টমী কুসুমদের বৈষ্ণবীয় সাধনপ্রণালী অনুযায়ী বিবাহ কার্য সম্পন্ন হলেও তাদের মিলনের পথে বহু বাধা বিঘ্নকে অতিক্রম করতে হয়েছে। বিরহের প্রজ্জ্বলিত অগ্নিপরীক্ষায় দুটি বিরহী আত্মাই বৈষ্ণবীয় প্রেমালেখ্যে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা, বিচ্ছেদ, প্রতীক্ষা, যন্ত্রণার স্রোতে অবগাহিত হয়ে খাঁটি সোনায় পরিণত হয়েছে। ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র দুটি সহজিয়া সাধনপথের প্রাণপুরুষকে আধুনিক বাস্তবের মৃত্তিকায় দণ্ডায়মান করেই নারীমনস্তত্ত্বের, পুরুষের চরিত্র গরিমায় এমন তন্তুতে গ্রথিত করেছেন, যেখানে তারা পরিশেষে সর্বস্ব উজাড় করে শুধুমাত্র প্রাণের তাগিদ একে ওপরের কাছে আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়েই ঈশ্বরসেবার পথে নিজেকে উন্নীত করেছেন। এ প্রসঙ্গে রাধাকৃষ্ণের একটি মিলন পদকে বড়ই প্রাসঙ্গিক মনে হয়েছে—

''দুহুঁ মুখ-দরশনে দুহুঁ ভেল ভোর।
দুহুঁক নয়নে বহে আনন্দ লোর।।
দুহুঁ তনু পুলকিত গদগদ ভাষ।
ঈষদবলোকনে লহুলহু হাস।।''[২৪]

গোবিন্দদাসের এ পদে যেরূপ রাধাকৃষ্ণের মিলনক্ষেত্র রচিত হয়েছে, তেমনি শরৎচন্দ্র উপন্যাসের শেষে এমনই এক বৈষ্ণবীয় প্রেমতত্ত্বগত মিলনকে স্পষ্টতা দিতে সক্ষম হয়েছিলেন কুসুম ও বৃন্দাবনের মধ্য দিয়ে।

শ্রীকান্ত-প্রথম পর্ব (১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দ):

শরৎচন্দ্রের বহু চর্চিত উপন্যাসের মধ্যে 'শ্রীকান্ত' খুবই জনপ্রিয় একটি উপন্যাস। এই

উপন্যাসের পর্ব সমূহে দৃষ্টিপাত করলে জানা যায়—

১. শ্রীকান্ত— প্রথম পর্ব ১২ ফেব্রুয়ারী, ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দ, 'ভারতবর্ষ' পত্রিকা।

২. শ্রীকান্ত— দ্বিতীয় পর্ব, ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দ, 'ভারতবর্ষ' পত্রিকা।

৩. শ্রীকান্ত— তৃতীয় পর্ব, ১৮ এপ্রিল, ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দ, 'ভারতবর্ষ' পত্রিকা।

৪. শ্রীকান্ত— চতুর্থ পর্ব, ১৩ মার্চ, ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দ, 'বিচিত্রা'পত্রিকা।

প্রতিটি পর্ব নিয়েই আলোচনা করা হবে, তবে 'শ্রীকান্ত-প্রথম পর্ব'-এর প্রথম পর্বের প্রাথমিক তথ্য থেকে জানা যায়— ১৩২২ বঙ্গাব্দের মাঘ থেকে, ১৩২৩ বঙ্গাব্দের মাঘ পর্যন্ত মোট তেরোটি সংখ্যায় ভারতবর্ষ পত্রিকায় 'শ্রীকান্তের ভ্রমণ কাহিনী'- নামে উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। তবে মাঘ, ফাল্গুন সংখ্যায় লেখকের নাম হিসেবে শ্রীকান্ত শর্মা উল্লিখিত থাকলেও পরবর্তী সংখ্যাগুলিতে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামেই প্রকাশিত হয়। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী, ভারতবর্ষ পত্রিকার মালিক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় তাঁর প্রকাশনা সংস্থা 'গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স' এই তেরোটি সংখ্যার মিলিত রূপে 'শ্রীকান্ত-প্রথম পর্ব' নামে গ্রন্থটি প্রকাশিত করেন।

রচনাকাল সংক্রান্ত সাধারণ তথ্য পরিবেশনের পর আমরা কাহিনীর গভীরে প্রবেশ করতে চলেছি। উপন্যাসের প্রাথমিক তথ্য থেকে স্পষ্ট অনুমিত হয় যে, চারখণ্ডে রচিত এটি একটি আত্মজৈবনিক উপন্যাস। স্বাভাবিক ভাবে ভ্রমণ কাহিনীর গতিপথে ঔপন্যাসিক সমাজনিষিদ্ধ বা সমাজ বিরুদ্ধ প্রেমোচ্ছবিকে ব্যাপক ও বহুবিস্তৃত প্লটে উপস্থাপিত করেছেন। একটি অবৈধ প্রেমাঙ্গিকের রঙ্গমঞ্চে লেখক তাঁর সুচারু জীবনদৃষ্টি তাত্ত্বিক সংব্যাখ্যানকে এখানে তুলে ধরেছেন। যে সকল আত্মজৈবনিক বৈশিষ্ট্যে তিনি উপন্যাসকে গতিময়তা দিয়েছেন তাতে উপন্যাসটি যথাযথ রসোত্তীর্ণ হয়েছে। উপন্যাসের প্রধান চরিত্রেরাই শ্রীকান্তর জীবন অভিজ্ঞতাকে পরিপূর্ণতা দিয়েছেন, উপন্যাসটি কাহিনীর ঘনঘটায়, বহু চরিত্রের চিত্রশালায় প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠেছে। শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মীর প্রণয়কাহিনী, এছাড়াও শ্রীকান্তের জীবনে যে সকল চরিত্রেরা তাকে সমৃদ্ধ করতে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে তারা হলেন— প্রথম পর্বের ইন্দ্রনাথ ও অন্নদাদিদি, দ্বিতীয় পর্বের অভয়া, তৃতীয় পর্বের ব্রজানন্দ ও সুনন্দা এবং চতুর্থ পর্বের গহর ও কমললতার হার্দিক ও সামাজিক সম্পর্কের বহু কৌণিক রূপাঙ্গিক। চরিত্রগুলি শ্রীকান্তর প্রতিটি পৃথক পর্বের স্বতন্ত্র মর্যাদা দান করেছে। বলা যায় লেখক শরৎচন্দ্রই যেন শ্রীকান্ত হিসেবে তার মনস্তাত্ত্বিক জীবনকে তথা এর উত্থান পতনকে উপন্যাসের চারটি পর্যায়ে দেখাতে চেয়েছেন।

'শ্রীকান্ত- প্রথম পর্ব'-এর আলোচনায় কতগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন ঘটনা একে অপরের

সঙ্গে এমন এক সম্পর্কের সেতু নির্মাণ করেছে যা জীবনের বহু পরিচিত আবেষ্টনীর মধ্যে সূক্ষ্ম মানবিক মহিমার স্রোতপ্রবাহে বাহিত হয়েছে, তাতে একটি কাহিনীবৃত্তে অন্নদাদিদির বাৎসল্য পরায়ণতা, অন্য কাহিনীতে উঠে এসেছে বঙ্কু ও পিয়ারীর অকৃত্রিম স্নেহকাতর সম্পর্কের অবলম্বন। প্রত্যক্ষ প্রভাবে সরাসরি কোন বৈষ্ণবীয় উক্তি প্রত্যক্তির প্রতিচ্ছবি না থাকলেও বৈষ্ণবীয় রসতাত্ত্বিক ভাব মাধুর্য্যের রসনির্যাস কাহিনীকে যথেষ্ট পরিমাণ সমৃদ্ধ করেছে। শ্রীকান্তের বাল্য জীবনের যে অভিজ্ঞতা ও দুঃসাহসিকতার ভাবাবেগ কাহিনীকে গতি দান করেছে, তাকে ইন্দ্রনাথের মত বন্ধুর সান্নিধ্যে, তার সঙ্গে গড়ে ওঠা সখ্যতা, চরম বাস্তবতার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সম্মুখীন করিয়েছেন লেখক এবং এরই মধ্য দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন বাল্য জীবনের বহুচর্চিত সংস্কারের মধ্যেও নতুনকে স্বাগত জানানো সম্ভব। সকল ধর্মসংস্কারের ঊর্ধ্বে হৃদয়বৃত্তির গতিবেগ সর্বশীর্ষে বিদ্যমান। ইন্দ্রনাথ, অন্নদাদিদি, পিয়ারী বাঈ এরাই যেন সেই সমাজ প্রচলিত বিধি নিষেধের ঊর্দ্ধে মানবিক সম্পর্ককে মর্যাদা দিয়ে তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন। ঔপন্যাসিকের জীবন অভিজ্ঞতার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এরাই। লেখক উপন্যাসের শুরুতেই বলেছেন—

''আমার এই 'ভবঘুরে' জীবনের অপরাহ্ন বেলায় দাঁড়াইয়া ইহারই একটা অধ্যায় বলিতে বসিয়া আজ কত কথাই না মনে পড়িতেছে।''[২৫]

এই ভবঘুরে জীবনের প্রথম প্রভাত লগ্নে পরম স্নেহধন্য হিসেবে শ্রীকান্তের জীবনে স্থান পেয়েছে ইন্দ্রনাথের মত বন্ধু। একটি ফুটবল ম্যাচে তাদের পরিচয় হয়। কালো, বাঁশির মত নাক, সুডোল কপাল প্রভৃতি শারীরিক বর্ণনায় তার শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের পরিচয় শ্রীকান্ত প্রথম সাক্ষাতেই অনুধাবন করে। ইন্দ্রনাথ ও শ্রীকান্তের দুঃসাহসিক মাছ শিকারের সংলাপটি যেমন লোমহর্ষক তেমনি রোমাঞ্চকর। সেই মাছ শিকারের পরবর্তী সময়ে ইন্দ্রনাথ যখন শ্রীকান্তকে জেলে পাড়ার নিকটবর্তী স্থানে অপেক্ষারত অবস্থায় কিছু সময়ের জন্য রেখে চলে যায়, তখন শ্রীকান্তর মনে এক বৈষ্ণবীয় প্রেমতত্ত্বগত প্রেক্ষাপট আভাসিত হয়েছে ঠিক এভাবেই—

''মানুষের এই কিশোর বয়সটার মত এমন মহাবিস্ময়কর বস্তু বোধ করি সংসারে আর নাই। ... কিশোর-কিশোরীর মনের ভাব বোধ করি একেবারেই অজ্ঞেয়। তাই বোধ করি, শ্রী বৃন্দাবনের সেই দুটি কিশোর-কিশোরীর কৈশোরলীলা চিরদিনই এমন রহস্যে আবৃত হইয়া রহিল। বুদ্ধি দিয়া তাহাকে ধরিতে না পারিয়া, তাহাকে কেহ কহিল ভালো, কেহ কহিল মন্দ ... এমন রসের উৎস কিন্তু আর কোথাও নাই। যাহাদের রুচির সহিত মিশ খায় নাই, তাহারাও স্বীকার করিল, এই পাগলের দলটি ছাড়া সংসারে এমন গান কিন্তু আর কোথাও শুনিলাম না।

কিন্তু এত কাণ্ড যাহারে আশ্রয় করিয়া ঘটিল— সেই যে সর্বদিনের পুরাতন, অথচ চিরনূতন— বৃন্দাবনের বনে বনে দুটি কিশোর-কিশোরীর অপরূপ লীলা—বেদান্ত যাহার কাছে ক্ষুদ্র মুক্তিফল যাহার তুলনায় বারীশের কাছে বারিবিন্দুর মতোই তুচ্ছ— তাহার কে কবে অন্ত খুঁজিয়া পাইল? ... তাই বলিতেছিলাম, তেমনি সেও ত আমার সেই কিশোর বয়স! যৌবনের তেজ এবং দৃঢ়তা না আসুক, ... প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা ত হৃদয়ে সজাগ হইয়াছে!"[২৬]

অংশটিতে শ্রীকান্তের মানসপটে কিশোর-কিশোরীর সাধারণ হৃদয়জাত প্রবৃত্তিকে তিনি বৃন্দাবন লীলার সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাঁর কল্পিত অচেনা দুজন নর-নারী যেন হয়ে উঠেছেন শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা। রাধাকৃষ্ণের মিলন পথে যেমন বহু কন্টর্কিত বিপত্তি ছিল, তেমনি বাস্তব নরনারীর প্রেমালেখ্য নির্মাণের পটভূমিকায় কেউ তাকে স্বীকৃতি দেয়, কেউ তাকে কুৎসিত অবয়বে পরিচিত করেন। লেখক নিজেই জানিয়েছেন যারা এই লীলামাহাত্ম্য অনুধাবন করে, রসের মহিমায় নিমজ্জিত হয়ে উন্মাদ হয়েছেন শুধুমাত্র তারাই এর রহস্য সমাধানের পথ বের করতে সক্ষম হয়েছেন। অর্থাৎ এই নামসংকীর্তন প্রেম মাহাত্ম্য প্রচার, রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তির— অবয়বে লেখক উপন্যাসে আগামী প্লটের ইঙ্গিত দিয়েছেন সেই নির্জন স্থানের একাকী মুহূর্তের আত্মকথনে। আর এই প্লট ভাবনাই আগামীতে উপন্যাসে বৈষ্ণবীয় পঞ্চরসের উপস্থাপনায় বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে তা নিঃসন্দেহে অনুমিত হয়। ঔপন্যাসিক ইন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্রীকান্তের যে স্বল্প সময়ের সখ্যতায় গোপবালকের প্রসঙ্গ টেনে তাদের দুজনকে নিয়ে গেছেন বৃন্দাবনের পবিত্রধামে। তাদের সখ্যতা যেন সকল বন্ধনহীন, সুহৃদের প্রতি অনুরাগে কাতর, জীবনের বাঁধভাঙা উদ্দামতার মধ্য দিয়ে যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্জাত হয়, ঠিক তেমনি এই দুটি ছেলের মধ্যে সেই যৌবনোচ্ছ্বাসকে বৈষ্ণব পদাবলীর সখ্য রসে নিমজ্জিত করে তিনি দেখিয়েছেন। এক অচেনা, অজানা বোহেমিয়ান জীবনের প্রতি আকর্ষণেই শ্রীকান্ত ও ইন্দ্রনাথ তারা দুজন দুজনের সঙ্গী হয়েছেন।

সখ্যরসের এক সুন্দর অভিব্যক্তি দুজনের আচরণে স্পষ্ট উঠে এসেছে। এই রস ভক্তিরসেরই নামান্তর। ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে যেমন সম্ভ্রমশূন্য প্রীতির সম্পর্ক বিদ্যমান, ঠিক সেই প্রকার সম্ভ্রমশূন্যতা দুটি ছেলের মধ্যে অনুভব করা যায়। এতে স্থায়ীভাব 'বিশ্রম্ভ' অর্থাৎ সংকোচহীন পারস্পরিক বিশ্বাস রতির অবস্থান বিদ্যমান। এরই মধ্যে শান্তরসের নিষ্ঠা ও দাস্যরসের সেবামূলক মনোভাব অন্তর্নিহিত থাকে। ঠিক যেভাবে ইন্দ্রনাথের একটি মাত্র কথায় শ্রীকান্ত এই স্বল্প পরিচিত সঙ্গীটির উপর আস্থা রেখে অপরিচিত স্থানে একাকী নির্জনে তার প্রতি বিশ্বাসে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়নি। উপরন্তু একটি অপূর্ব বৈষ্ণবীয় ভাবাশ্রিত নরনারীর চিত্রকল্পকে আপন কল্পনায় দৃশ্যমান

করেছেন। ইন্দ্রনাথের প্রতি তার স্নেহ, বিশ্বাস মায়ামুগ্ধ গোপবালকের মত তাকে পরম সখ্যতার দুয়ারে উপনীত করে। এই সম্পর্কের মধ্যেও প্রেম ভক্তি বিদ্যমান। তাইতো বলা যায়—

''শান্তের গুণ দাস্যের সেবন সখ্যে দুই হয়; অতএব সখ্যরসে বশ ভগবান।''[২৭]

এভাবেই ভিন্নজাতীয় বর্ণনায় ঔপন্যাসিক দু'জন দুঃসাহিক ছেলের উন্মত্ত কার্য পরিকল্পনায় উপন্যাসের আগামী গুরুত্বপূর্ণ কাহিনীর সম্মুখীন হয়েছেন। এই দুজনের সৌভাগ্যেই পাঠক অন্নদাদিদির সন্ধান পেয়েছে। অন্নদাদিদির অতিসংক্ষিপ্ত পরিচয়ই আমরা উপন্যাসের মধ্য থেকে পাই, তিনি উপন্যাসে নায়িকা বা প্রধান চরিত্র হিসেবে উপস্থিত হননি। মোহিতলাল মজুমদারের একটি উদ্ধৃতি অন্নদাদিদি সম্পর্কে বড়ই প্রসঙ্গিক—

''আমাদের দেশে, আমাদের দেশে কেন, সব দেশেই নারীর প্রকৃতিতে বা চরিত্রে এমন একটা কিছু আছে যাহা পুরুষ-প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিপরীত; এজন্যই পুরুষ কখনো নারীকে বুঝতে পারিল না— পরিবার প্রয়োজনও তাহার হয় নাই, তাহাতে সাধারণ জীবন-যাত্রায় বাধে না।''[২৮]

অন্নদাদিদি প্রসঙ্গে একথা সার্থকতার মধ্যে সংস্কার ও প্রজ্জ্বলিত নারীত্বের মার্জিত সংমিশ্রিত পরিলক্ষিত হয়েছে। শ্রীকান্তের বর্ণনায় তিনি—

'' যেন ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি। যেন যুগ-যুগান্তরব্যাপী কঠোর তপস্যা সাঙ্গ করিয়া তিনি এইমাত্র আসন হইতে উঠিয়া আসিলেন। বাঁ-কাঁকালে আঁটিবাঁধা কতকগুলি শুকনো কাঠ এবং ডানহাতে ফুলের সাজির মত একখানা ডালার মধ্যে কতকগুলো শাক-সবজি। পরনে হিন্দুস্থানী মুসলমানীর মতো জামাকাপড়-গেরুয়া রঙে ছোপানো, কিন্তু মলিন নয় হাতে দুগাছি গালার চুড়ি। সিঁথায় হিন্দু- নারীর মত সিঁদুরের আয়তি-চিহ্ন।''[২৯]

এভাবেই অন্নদাদিদির মধ্যে শ্রীকান্ত এক তপস্বিনী মূর্তি প্রত্যক্ষ করে। তার এই তপস্যা যেন আপন হৃদয় বলে কৃচ্ছ্রসাধন, এ যেন সতীত্বের চরম আত্মোৎসর্গীকৃত এক নারী সত্তার তীব্র অন্তর্দহন। শ্রীকান্ত দিদির পতিভক্তিও সতীত্বের গুণকে এক বৃহৎ শক্তিরূপেই মর্যাদা দিতে চেয়েছেন। সমাজ, পরিবার ও শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড়িয়ে তার নারীত্বের বিশেষ মহিমা উন্মোচিত হয়েছে। শ্রীকান্তের অন্নদাদিদির রূপবর্ণনায় চণ্ডীদাসের কৃষ্ণবিরহী রাধার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, ঠিক যেভাবে রাধার নীল শাড়িখানি যোগিনীর গেরুয়া বসন ধারণ করে শ্রীমতীর নব পরিচয়কে পরিণাম দিয়েছে, ঠিক তেমনি চণ্ডীদাসের ভাবনার শরৎচন্দ্র অন্নদাদিদিকে তপস্যারত যোগিনী মূর্তি রূপে গেরুয়া ছোপানো বস্ত্রে আভূষিত করে, তার বর্ণনা শ্রীকান্তর মুখ নিঃসৃত করে উপন্যাসে একটি বৈষ্ণবীয় প্রতিচ্ছবির সমতুল্য পরিবেষ্টনী রচনা করেছেন। এই দিদির প্রতিই প্রথম দর্শনেই শ্রীকান্তের

হৃদয়ে এক স্নেহকাতর বালকের অনুভূতি জাগ্রত হয়— ইন্দ্রনাথের সঙ্গে তার কথোপকথনের মধ্য থেকেই শ্রীকান্তও দিদির প্রতি এক অসীম বাৎসল্যময় মমতা অনুভব করে। শাহজী অর্থাৎ দিদির স্বামীর মৃত্যুতে দিদির অবিচলিত সহ্যশক্তি ও নারীত্বকে শ্রীকান্ত অনুভব করেছে। এমনকি শ্রীকান্তের কাছে থেকে ধার নেওয়া কটা টাকাও দিদি শোধ করে যায়। শাহজীর মৃত্যুর পর দিদি নিরুদ্দেশ হবার কালে অন্তরের অবচেতনে শ্রীকান্তের উদ্দেশ্যে যা বলেন তাতে তা অপরূপ বাৎসল্য মহিমায় প্রকাশিত—

''চিঠিতে লেখা ছিল, শ্রীকান্ত, যাইবার সময় আমি তোমাদের আশীর্বাদ করিতেছি। শুধু আজ নয়, যতদিন বাঁচিব, ততদিন তোমাদের আশীর্বাদ করিব। ... তুমি যে পাঁচটি টাকা একদিন রাখিয়া গিয়াছিলে, তাহা খরচ করি নাই। ... মনে দুঃখ করিয়ো না ভাই। টাকা কয়টি ফিরাইয়া দিলাম বটে, কিন্তু তোমার ওই কচি বুকটুকু আমি বুকে পুরিয়া লইয়া গেলাম। ... শ্রীকান্ত, আমার কথা ভাবিয়া তোমরা মন খারাপ করিও না। আমার ভাই দুটি, তোমাদের কি বলিয়া যে আশীর্বাদ করিব খুঁজিয়া পাই না। ... ভগবান পতিব্রতার যদি মুখ রাখেন, তোমাদের বন্ধুত্বটি যেন চিরদিন তিনি অক্ষয় করেন।''[৩০]

এভাবে শরৎচন্দ্র বুদ্ধিমত্তায়, আন্তরিক শক্তি সামর্থ্যে একজন তেজস্বিনী ও বাৎসল্যময়ী নারীর চিত্ররূপ অন্নদাদিদির মধ্য দিয়ে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। শরৎচন্দ্রের অনুরূপ অনুভবকে তিনি শ্রীকান্তের অনুভবে মিলিত করে শেষপর্যন্ত পরম স্নেহময় এক সম্পর্কের প্রতিমূর্তি নির্মাণ করেছেন, তাতে পরোক্ষ আঙ্গিকে হলেও সম্পৃক্ত করেছেন বৈষ্ণবীয় রসমালাকে। এ রস সখ্য, শান্ত ও বাৎসল্যের মিলিত পরাকাষ্ঠায় উপন্যাসকে বাস্তবগ্রাহ্যতা প্রদান করেছে। মাতৃগর্ভজাত ভগবান কৃষ্ণের প্রতি মাতা যশোদা যে সুমধুর অনাবিল মাতৃস্নেহ অনুভব করতেন, সেই স্নেহাতুরা মূর্তিমতী বৎসলতাই শরৎচন্দ্র অন্নদাদিদির চিঠির ভাষায় ইন্দ্রনাথ ও শ্রীকান্তের প্রতি পরোক্ষভাবে ব্যক্ত করেছেন। আবার এদিকে শ্রীকান্ত ও ইন্দ্রনাথের সখ্যতাও যেন বালক কৃষ্ণ কানাই এর সঙ্গে তার প্রিয়সখা সুবলের প্রসঙ্গকেস্মরণ করায়। কারণ তিনিই ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় নর্মসখা, সখারা যেমন ছিল শ্যামগতপ্রাণ ঠিক সেভাবেই ইন্দ্র অদর্শনে শ্রীকান্তের চিত্ত চঞ্চলতা বৈষ্ণবীয় রসতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটে সাদৃশ্যে নির্মিত হয়েছে। শ্রীকান্তের জীবনে ইন্দ্রনাথের সখ্যতা সকল দুঃসাহসিক ও সামাজিক সংস্কারের ভ্রুক্ষেপহীনতার কথাই প্রতিপাদ্য করে। ইন্দ্রনাথকে সে প্রয়োজনে, অপ্রয়োজনে, আপন হৃদয়ের দুর্বলতর পরিস্থিতিতে বন্ধন ভীরু ঔদাসিন্যকে জয় করার ক্ষেত্রে, অনাবৃত জীবনের উচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে, যেভাবে তার সান্নিধ্যে অনুপ্রাণিত হয়েছে, তা উপন্যাসের পরবর্তী

ধাপে তার এই সখা সম্পর্কের মূল্য নির্ধারণের মধ্য দিয়েই সে পরিণতির দিকে এগিয়ে গেছেন বললে অত্যুক্তি হয় না।

এরপর কাহিনীতে পৃথক এক প্রেক্ষাপট বিবৃত হয়েছে। একরাজার ছেলের শিকার পার্টির নিমন্ত্রণে পাটনা থেকে আগত বাঈজী পিয়ারীর সঙ্গে শ্রীকান্তের পরিচয় হয়। প্রথম পর্বে শ্রীকান্তের সঙ্গে পিয়ারী কথোপকথনে এক নারীত্বের পূর্ণ পরিচয় অনুভব করেন তিনি। তার জীবনের দুর্ভাগ্যপীড়িত এই অবস্থার জন্য এক প্রকার স্নেহ, মমত্ব ও মানবিক প্রেমের দুর্জ্ঞেয় রহস্য তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারেন, আপন মনেই শ্রীকান্ত পিয়ারীর প্রতি যে সহানুভূতি দেখান, তাতে সমালোচক মোহিতলাল মজুমদারের মতে চণ্ডীদাসের যোগিনী রাধার কথাই উঠে আসে —

''দেখিতে দেখিতে হরে
তনু মন চুরি করে;
না চিনি যে-কালা কিম্বা গোরা।''[৩১]

রাধার ভক্তির অব্যক্ত বেদনাই পিয়ারীর মনোভাবকে প্রতিকায়িত করতে ব্যবহৃত হয়েছে। তার বাঈজী জীবনের তিক্ততা থেকে পরিত্রাণের হেতুই প্রেমাস্পদের প্রতি তার এই ভাবনার উদয় হয়েছে। তবে চণ্ডীদাসের শ্লোকটি উপন্যাসটির প্রয়োজনীয় মনোভাবকে ব্যক্ত করতে সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার কিঞ্চিত শব্দ পরিবর্তন করলেও ভাবকে অপরিবর্তিত রেখেছেন। এখান থেকেই সূত্রপাত হয় পিয়ারী ও শ্রীকান্তের প্রণয় সম্পর্কের প্রথম পদক্ষেপের। উপন্যাসের দশম পরিচ্ছেদে রাত্রির এক অপরূপ রূপ বর্ণনায় শ্রীকান্তের অন্তর্চৈতন্যে প্রাকৃতিক তথা বাস্তব চিত্রকল্পে শ্রীরাধার স্মৃতি ধরা দিয়েছে। গহন অরণ্যে রাত্রির রূপ দেখতে দেখতে তিনি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অনন্তকে অনুভব করেন, যা অচিন্ত্য, যা সীমাহীন। এ সীমাহীন অন্ধকার শ্রীকান্তের দৃষ্টিতে যেন মৃত্যুর নামান্তর। তাই তো উপন্যাসে সে স্পষ্ট উদ্ধৃতি করেছেন—

''মৃত্যু তাই মানুষের চোখে এত কালো, তাই তার পরলোকের পথ এমন দুস্তর আঁধারে মগ্ন। তাই রাধার দু-চক্ষু ভরিয়া যে-রূপ প্রেমের বন্যার জগৎ ভাসাইয়া দিল তাহাও ঘনশ্যাম! কখনো এ-সকল কথা ভাবি নাই, কোন দিন এ পথে চলি নাই; তবুও কেমন করিয়া জানি না, এই ভয়াকীর্ণ মহাশ্মশান-প্রান্তে বসিয়া নিজের এই নিরুপায় নিঃসঙ্গ একাকিত্বকে অতিক্রম করিয়া আজ হৃদয় ভরিয়া একটা অকারণ রূপের আনন্দ খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল।''[৩২]

এইপ্রকার উদ্ধৃতির মধ্য দিয়ে শ্রীকান্ত বিরহিনী, তপস্বিনী, অভিসারিকা শ্রীরাধার প্রেমের উন্মাদনাকে শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তির নিরিখে বিচার করেছেন। এই উন্মাদিনী শ্রীরাধার চিত্ত ব্যাকুলতা বা

প্রিয় প্রাপ্তির আকুলতা, প্রেমোন্মাদনাকে শ্রীকান্ত তার সকল দেহ-মনে অনুভব করেছে। মহাশ্মশানের নির্জন তমসাময় রাতে পিয়ারীর প্রতি উৎকণ্ঠাই হোক বা অচেনা কোন চিত্তবৃত্তির আগ্রহেই হোক আজ তার এই নিশীথ রাত্রিকে প্রিয় মিলনের রাত্রি হিসেবে মনে হয়েছে। সে কারণে এ নির্জন মুহূর্ত তার কাছে হয়ে উঠেছে ব্যথাহারী অনন্ত সুন্দর। তাই এই তমসামৃত মৃত্যুমন্দির প্রান্তকে তিনি মহানগরের দুয়ার রূপে অনুভব করেন। পিয়ারীর প্রতি শ্রীকান্তের চিত্ত চাঞ্চল্য সম্পর্কের সন্ধিলগ্ন কাল থেকেই আমরা অনুরণিত হতে শুনি। শ্রীকান্তই যেন ঘনশ্যাম, পিয়ারীই যেন প্রেমময়ী শ্রীমতী রাধা। সে কারণেই গরুর গাড়িতে শ্রীকান্তের হাত ধরে পিয়ারী তাকে সেই অন্ধকার জীবন থেকে উদ্ধার করতেও বিন্দুমাত্র সংশয়বোধ করেনি। এমনকি পিয়ারী শ্রীকান্তকে অসৎ সঙ্গ থেকে দূরে রাখতে নিজের হাতের আংটি তার পায়ের কাছে রেখে প্রণাম করে ও বাড়ি ফিরে একটি চিঠি লেখার অনুরোধ করে স্পষ্টতই তার হৃদয়ের অর্ঘ্য প্রদান করে, নিজ হৃদয়ের দোলাচলতাকে শ্রীকান্তের নিকট স্পষ্ট করে দেয়। পিয়ারী এই প্রার্থনার মধ্য দিয়ে যেন বৈষ্ণব পদসাহিত্যের— শ্রীরাধার প্রার্থনার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সেখানে তিনি প্রভু কৃষ্ণকে ভোগাক্লিষ্ট জীবন থেকে স্বাভাবিক সুস্থ জীবনে ফিরে যেতে যেভাবে অনুরোধ করেছেন, ঠিক তেমনি পিয়ারী শ্রীকান্তকে খারাপ স্থানে রাত্রি যাপন থেকে নিষেধ করে গেছেন। যেখানে বিদ্যাপতি রাধাভাবে ভাবিত হয়ে কৃষ্ণের চরণে যেমন জীবন উৎসর্গ করতে চেয়েছিলেন, ঠিক তেমনি পিয়ারীর এই অনুরোধকে অনুরাগের প্রথম পর্বের সূচনা বলে গণ্য করা হয়—

''মাধব বহুত মিনতি করি তায়।
দেই তুলসী তিল এ দেহ সমর্পিলুঁ
দয়া জনি ছোড়বি মোয়।।''[৩৩]

উপন্যাসের পরবর্তী অংশে বোহেমিয়ান জীবনের আকর্ষণে শ্রীকান্ত পাটনার উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। সেখানে তিনি এক সন্ন্যাসীর সংস্পর্শে আসেন। পিয়ারীর চিন্তা থেকে অন্তর্হিত হয়ে মুক্তি মার্গের সিংহদুয়ারকেই জীবনের লক্ষ্যবস্তু রূপে চিহ্নিত করেন। সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করে মোক্ষ সাধনের উদ্দেশ্যে তিনি প্রতিদিনই ভিক্ষাবৃত্তিতে বের হতেন। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে কেউই তাকে বিমুখ করতো না। গুরুদেব ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম যাত্রায় তিনিও সঙ্গী হন। এভাবেই শ্রীকান্ত জীবনমুক্তির দোদুল্যমান সেতুতে দাঁড়িয়ে সে ক্রমশ জটিলতর আবহে নিজেকে নিয়ে গেছেন পৃথক মার্গে। সন্ন্যাসী জীবনের প্রতি তার এক গভীর সহমর্মিতা সর্বদাই অন্তরে বিদ্যমান ছিল। কারণ এ জীবনে সংযম, মোহমুক্তির দিকই সে অধিক লক্ষ্য করে। এমনকি উপন্যাসের শেষে

পিয়ারীর সঙ্গে পুনরায় সাক্ষাতে সে সন্ন্যাস জীবনের সর্বত্যাগী ভাবনা থেকে পুনরায় ভক্তি, প্রীতি, প্রেমের নিত্য ধামে পদার্পণ করলেন। তাই প্রবল জ্বরে পিয়ারীর সেবা প্রাপ্তিতে সে প্রেমের জগতে নিজেকে আবদ্ধ রাখতে চান। কিন্তু বাস্তবের কষাঘাতে সে বিদায়কালে অনুভব করে—

''বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না— ইহা দূরেও ঠেলিয়া ফেলে। ছোটখাটো প্রেমের সাধ্যও ছিল না— এই সুখেশ্বর্য-পরিপূর্ণ স্নেহ-স্বর্গ হইতে মঙ্গলের জন্য, কল্যাণের জন্য আমাকে আজ একপদও নড়াইতে পারিত।''[৩৪]

অন্তিম উক্তির মধ্য দিয়ে শ্রীকান্ত পিয়ারীর প্রতি এক গোপন মমত্ব অনুভব করে। পিয়ারীর বন্ধু অর্থাৎ সতীনের ছেলের প্রতি স্নেহ দেখে, তার নারীত্বের প্রবল আকর্ষণেই সে তার থেকে দূরে যাবার সিদ্ধান্ত নেন, আন্তরিক প্রেমের স্বীকৃতিতে। বৈষ্ণবীয় অনুষঙ্গের সূত্রে প্রথমেই শ্রীকান্তের ঘনশ্যাম কেন্দ্রিক স্বগোতোক্তি, শ্রীমতী রাধার প্রসঙ্গ, বিরহ, যন্ত্রণার দাবদাহে মিলিত চিত্র-প্রতিচিত্র রচনার ক্রীড়ায় সে যেন পিয়ারীর মধ্যে শ্রীরাধার তপ্ত, শোকার্ত সত্তাকে অনুভব করেছেন। এভাবেই শ্রীকান্তের প্রথমপর্বে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উক্তি, প্রত্যক্তিতে বৈষ্ণবীয় অনুষঙ্গের আখ্যায়িকা উঠে এসেছে।

তাই পরিশেষে একথাই বলা যায় ইন্দ্রনাথ ও শ্রীকান্তের প্রথম কৈশরের সখ্যত্বে বৈষ্ণবীয় 'সখ্যরস'-এ, অন্নদাদিদি বা নিরুদিদির প্রতি শ্রীকান্তের স্নেহমমতায় 'বাৎসল্য রস' যেমন প্রতিকায়িত হয়েছে। ঠিক তেমনি পিয়ারী বাঈজীর সঙ্গে শ্রীকান্তের প্রথম সাক্ষাত থেকে পাটনার স্মৃতি পর্যন্ত বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের বিরহিনী রাধার যে তপস্বিনী প্রতিমূর্তি অনুভূত হয়েছে তাতে একথা স্পষ্ট বলা যায় যে ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র এই উপন্যাসের প্রথম পর্বে এবং শ্রীকান্তের বোহেমিয়ান, সন্ন্যাসী জীবনের প্রতি আসক্তি থেকে একটি সুক্ষ্ম বৈষ্ণবীয় রসতাত্ত্বিক ও প্রেমতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটকে সুচারু শিল্পীত মনোভাবে সংমিশ্রিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। উপন্যাসের পরবর্তী পর্বে এ অন্বেষণ স্পৃহা যেন এ পর্ব থেকেই তিনি প্রোথিত করে গেলেন একথা বললে অত্যুক্তি হয় না।

শ্রীকান্ত-দ্বিতীয় পর্ব (১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দ) :

'শ্রীকান্ত'-উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বটি ১৩২৪ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাস থেকে ১৩২৫ বঙ্গাব্দের আশ্বিন পর্যন্ত 'ভারতবর্ষ' পত্রিকাতেই 'শ্রীকান্তের ভ্রমণ কাহিনী' রূপেই প্রকাশিত হয়। কিন্তু ১৩২৪ বঙ্গাব্দের আশ্বিন ও কার্তিক এবং ১৩২৫বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যায় উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। উক্ত তিনটি সংখ্যায় অংশ মিলিয়েই ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ শে সেপ্টেম্বর 'গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স' থেকেই 'শ্রীকান্ত-দ্বিতীয় পর্ব' নাম দিয়ে গ্রন্থটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বে পিয়ারী ওরফে রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্তের পুনরায় সাক্ষাৎ হয় এবং বেশকিছু নতুন কাহিনী ও চরিত্রের ঘনঘটায় উপন্যাসে বৈষ্ণবীয় তত্ত্বগত অনুষঙ্গকে আমরা অনুধাবন করার চেষ্টা করি। শ্রীকান্তের জীবন কাহিনীতে রাজলক্ষ্মীর এক বিশেষ প্রভাব প্রথম পর্ব থেকেই পরিলক্ষিত হয়েছে। নিয়তিই হোক আর হৃদয় প্রবৃত্তির টানেই হোক এই পর্বেও শ্রীকান্ত কিছুদিন বাড়িতে থাকার পর আপন বিবাহ থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য পুনরায় রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। রাজলক্ষ্মী তার জীবন নির্ধারণে পুরোপুরি বাঈজী জীবনে পদার্পণ করেছে। শ্রীকান্তের সঙ্গে সাক্ষাতে পূর্বরাগের যে ছোঁয়া তার মনে প্রথম থেকেই সঞ্চারিত ছিল তা যেন পুনরায় অনুরাগের ছোঁয়া পেতে লাগল। উভয়ের হৃদয়ে জাগ্রত সুপ্ত প্রতিরোধ পীড়িত প্রেম জীবনের সহজ সরল গতিপথে মুক্তি পেতে চাইল। রাজলক্ষ্মী তার স্নেহ ছায়া হয়ে বর্মায় যেতে চাইলে, শ্রীকান্ত তা অগ্রাহ্য করে তাকে জীবন সমুদ্রে একাকী পতিত করে নিজেই গমন করলে তাদের সম্পর্কের সমান্তরাল রেখা পাঠকের নিকট স্পষ্ট হয়ে যায়। বিদায়ের নিস্তব্ধ ঘন রজনী মিলন ক্ষেত্র রচনার পূর্বেই বিরহের অতল সমুদ্রে মিলিয়ে গেলেও এ বিরহ যেন গোপনে ঐ দুই নরনারীর প্রেমচিত্তকেই পাঠকের সম্মুখে উন্মুক্ত করে দিয়েছে ঠিক এভাবেই— পিয়ারী ওরফে রাজলক্ষ্মী বললেন—

''নেবে আমাকে সঙ্গে? বলিয়া আমার পায়ের উপর ধীরে ধীরে আবার তাহার হাতখানা রাখিল। ... আজ তাহারই আবার এতবড় দুর্বলতা, এই করুণ কণ্ঠের সকাতর মিনতি, ... বলিলাম তোমাকে সঙ্গে নিতে পারিনে বটে, কিন্তু যখনই ডাকবে, তখনই ফিরে আসব! যেখানেই থাকি, চিরদিন আমি তোমারই থাকব রাজলক্ষ্মী।''[৩৫]

এ উক্তি যেন মধ্যযুগীয় রোমান্টিক পদসাহিত্যের প্রেমবৈচিত্র্য ও আক্ষেপানুরাগের সঙ্গে অধিক সাদৃশ্যময় অনুভূত হয়, মাথুরের খানিক পরশে শ্রীকান্ত ও পিয়ারী ওরফে রাজলক্ষ্মীর এই সমর্পিত চিত্র চাঞ্চল্য প্রকৃত অর্থেই বৈষ্ণবীয় রসসিক্ত তা বোঝা যায় 'উজ্জ্বল নীলমণি'-র এক বিশেষ উক্তিতে—

''প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেপি প্রেমোৎকর্ষ স্বভাবতঃ।
যা বিশ্লেষধিয়ার্তিস্তৎ প্রেমবৈচিত্ত্য মুচ্যতে।।''[৩৬]

এর অর্থ হল প্রিয়তমের সঙ্গে আন্তরিক মিলনে সমৃদ্ধ হয়েও আগত বিচ্ছেদ বেদনায় তারা উভয়েই কাতর হন। অর্থাৎ প্রেম ও প্রিয় মানুষের জন্য অতৃপ্তি জনিত চঞ্চলতা থেকেই প্রেমবৈচিত্ত্য বা আক্ষেপানুরাগের জন্ম। এ দুটি পদের ক্ষেত্রেই প্রিয় বিরহের বেদনা একে ওপরের হৃদয়কে

মোথিত করে। প্রেমের আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা, অনিচ্ছা, প্রিয়ের জন্য সমাজভীতি থেকে শুরু করে নানা সংস্কারগত বাধা যেমন রাধাকৃষ্ণের জীবনকেও প্রভাবিত করেছিল, ঠিক সেভাবেই চণ্ডীদাস বলেছেন—

‘‘ ঘর কৈনু বাহির বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন আপন কৈনু পর।।
রাতি কৈনু দিবস দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বন্ধু তোমার পিরীতি।।’’[৩৭]

পূর্বরাগ থেকে মাথুর পর্যন্ত যে ভাষা বা ভঙ্গিমায় রাধার আক্ষেপ কৃষ্ণ বিরহে উচ্চারিত হয়েছে। ঠিক তেমনি রাজলক্ষ্মী বিরহ কাতর রাধার ন্যায় নিজের জীবনে সে শ্রীকান্তের বিরহজনিত আক্ষেপ অনুভব করে তার যাত্রাসঙ্গী হতে চেয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণের মথুরা গমনের সংবাদে শ্রীরাধার অবচেতন মন যেভাবে বলে ওঠে এর পরিণাম চির বিচ্ছেদের মধ্যে পরিসমাপ্ত হবে, ঠিক তেমনি বিরহ তন্ময়তার গভীর তাত্ত্বিক দার্শনিক প্রেক্ষাপটেই শরৎচন্দ্রের রাজলক্ষ্মীর মধ্যেও বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের শ্রীরাধার মানসিকতা যেন সমভাবাপন্ন রূপেই প্রতিফলিত হয়েছে। শ্রীকান্তের বার্মা গমনের সংবাদ রাজলক্ষ্মীর হৃদয়ে মাথুর যাত্রার ন্যায় মনে হয়েছে। যে যাত্রা শ্রীকান্তের থেকে রাজলক্ষ্মীর জীবনে বহু দূরবর্তী অদৃশ্য দেওয়াল নির্মিত করে। আর এই বিরহবোধই মাথুরের যন্ত্রণাকে যেমন বৈষ্ণব কবিরা আধুনিক যুগ জিজ্ঞাসার দূরবর্তী চিত্রপটেও অমর স্বাক্ষর করেছেন। ঠিক সেভাবেই জীবন ও বাস্তবতার সঙ্গে হৃদয়বৃত্তির গভীরতর অন্তর্দ্বন্দ্বে রাজলক্ষ্মী, শ্রীকান্ত যেন নিজেদের সেই প্রকার কাব্যিক মানবানুভূতির জোয়ারে আপন হৃদয়কে নির্ভিক ভাবে একে ওপরের কাছে বিচ্ছেদকালে উন্মুক্ত করতে পেরেছেন। আর এই বিচ্ছেদ যন্ত্রণাকে সঙ্গী করে শ্রীকান্তের জীবনে যুক্ত হয় আরো নব অভিজ্ঞতাজাত বার্মাযাত্রার ফসল। যাত্রাকালে সে পরমহিতৈষিণী রাজলক্ষ্মীকে আন্তরিক স্বীকৃতি মূলক প্রেক্ষাপটে চিরদিন তার স্নেহধন্য হয়ে থাকার প্রতিশ্রুতিও দিয়ে গেছেন।

শ্রীকান্তের আত্মকথনে আরো একটি নারী চরিত্রের অবস্থান অন্যতম উপাদান হিসেবে উঠে এসেছে, চরিত্রটি হল অভয়া, যার প্রতি তার হৃদয়ের সহানুভূতিও সমবেদনার দিকটি বিশেষভাবে উঠে এসেছে। যিনি রাজলক্ষ্মীর স্মৃতিকে শ্রীকান্তর মনে ধীরে ধীরে কল্পনা করে আপন অন্তরের বিদ্রোহে সকল আসক্তিকে দূর করে প্লেগ ও মহামারীর ভয়ৎকর বাস্তবতায় নিজের অস্তিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। কিন্তু রাজলক্ষ্মীর ব্যক্তিত্বের উর্ধ্বে উঠতে পারেননি। যে কারণে

শ্রীকান্ত অভয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয় তা হল তার সম্প্রতিভ ও নিঃসঙ্কোচ ব্যবহার, দ্বিতীয়ত তার বুদ্ধিমত্তা ও কর্মকুশলতার পারদর্শিতা। অন্নদাদিদি বা রাজলক্ষ্মীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে এর কোন মিল নেই। রোহিনীদার প্রতি তার সেবামূলক মনোভাব থাকলেও তার প্রতি তার কোন চিত্ত চাঞ্চল্য সে কখনোই অনুভব করেনি। তার এই করুণা প্রীতি ঠিক যেন শ্রীকৃষ্ণের জীব উদ্ধারের প্রসঙ্গকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এ যেন প্রেম নয় মনের আন্তরিক মুক্তির মার্গে অন্তরের তেজস্বিতা ও ন্যায়বুদ্ধির মেলবন্ধন।

এরই মধ্য দিয়ে শরৎচন্দ্র এই দ্বিতীয়পর্বে টগর বৈষ্ণবীর মত একটি চরিত্রকে আমাদের সম্মুখে তুলে ধরে বাস্তবের রঙ্গ-রসিকতার দিককে চিহ্নিত করেছেন। নন্দ মিস্ত্রির সঙ্গে তার বহু চর্চিত জীবন চর্যায় যৌবন মিশ্রিত বহু স্মৃতি শ্রীকান্তকে ভাবিত করে। টগর শ্রীকান্তকে জানায়—

''টগর বোষ্টমীর হাত দিয়ে ওর মত কত গণ্ডা মিস্তিরি মানুষ হয়ে গেল— এখন ও আমার চোখে ধুলো দেবে?... অনেক পোড় খাইয়া টগর এটা বুঝিয়াছে যে, যেখানে সত্যকার বন্ধন নাই, সেখানে এতটুকু রাশ শিথিল করিলে চলিবে না, ঠকিতেই হইবে; হয় অহর্নিশি সতর্ক হইয়া জোর করিয়া দখল বজায় রাখিতে হইবে, না হয় যৌবনের মত নন্দ মিস্ত্রীও একদিন অজ্ঞাতসারে খসিয়া পড়িবে।''[৩৮]

খুব স্বল্প পরিসরে হলেও টগর বৈষ্ণবীর মত এক মনপোড়া, জীবন সমুদ্রে অভিজ্ঞ নারী, প্রেমের সন্ধানে নন্দমিস্ত্রির কাছে আত্মসমর্পণ করলেও আত্মসম্মানকে বিসর্জন দেননি। বৈষ্ণবীয় পরকীয়া তত্ত্বের একটি ক্ষুদ্র চিত্রপটে টগরের মত চরিত্র শ্রীকান্তের অভিজ্ঞতাকে পূর্ণতার দিকে আরো এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেছে।

একাদশ পরিচ্ছেদে মনোহর চক্রবর্তী বলে একজন প্রাজ্ঞ ব্যক্তির সহিত শ্রীকান্তের পরিচয় হয়। দাদাঠাকুরের হোটেলে একটি হরিনাম-সংকীর্তনের দল ছিল; তিনি প্রায়ই পুণ্য সঞ্চয়ের অভিপ্রায়ে কীর্তন শ্রবণ করতে যেতেন, ধনী ও অত্যন্ত হিসেবী মানুষ হলেও মৃত্যুকালে তিনি তার সকল সম্পদই রেখে যান। অর্থাৎ চরিত্রটির মধ্যে কৃষ্ণনাম শ্রবণ ও মুক্তির পথ অনুসন্ধানের মনোভাব থেকেই ঔপন্যাসিক আলোচ্য উপন্যাসে বিষ্ণুর উপাসনার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিধি রচনা করে বৈষ্ণবীয় ভাবধারার প্রতি তার আস্থাকেই সাদরে স্বীকৃতি দিয়েছেন। আর কৃষ্ণসাধনার মধ্য দিয়েই তিনি যে মুক্তি পথের আগ্রহী একথাও পরোক্ষে প্রতিপাদিত করেছেন। ফলে 'কৃষ্ণতত্ত্ব'-এর প্রতিচ্ছবিগত প্রেক্ষাপট স্বল্প পরিসরে পরিস্ফুট করেছেন ঔপন্যাসিক।

অভয়ার প্রতি সকল সমবেদনাকে অন্তরে নিয়ে শ্রীকান্ত কলকাতায় ফিরলেন। রাজলক্ষ্মী

ও বঙ্কুর সঙ্গে তার পুনরায় সাক্ষাৎ হল। অভয়ার হৃদয়ে শ্রীকান্তের প্রতি প্রেম জাগ্রত হলেও শ্রীকান্ত তার স্বীকৃতি দেননি আপন সম্ভ্রমবোধে। হৃদয়ের এই দ্বিধা দ্বন্দ্বের মধ্যেই পুনরায় তার জীবনে রাজলক্ষ্মীর আগমন ঘটেছে। রাজলক্ষ্মী পুনরায় মিলন পীড়িত দাবদাহে দগ্ধ হয়ে এক যোগিনীর আচার নিষ্ঠা ও কৃচ্ছ্রসাধনের বাসনাকে আপন চিত্তবৃত্তিতে লালিত পালিত করেছে। বহুকাল ব্যাপী বিচ্ছেদের পর রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তের সাক্ষাতে পুনরায় সকল সাধনার ঊর্ধ্বে আপন প্রেমের নির্মল অর্ঘ্য নিবেদন করতে এগিয়ে এলেন। সে কারণেই রাজলক্ষ্মী কলকাতা থেকে গাড়ি করে আপন অন্তরের ঐশ্বর্যে শ্রীকান্তের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্কের নিরিখে দেখা করতে আসেন। শ্রীকান্তের জন্যই লোক লজ্জাকে অতিক্রম করে অভিসারিকা রাধার ন্যায় সর্বত্যাগিনী সত্তারূপে শুধুমাত্র তাকে ভালোবেসে তার জন্যই সকল দুঃখ, সমালোচনাকে স্বেচ্ছায় মাথায় তুলে নিয়েছেন। সকল সম্পর্কের ঊর্দ্ধে সে তার প্রিয় মানুষের সন্ধানেই এই দুঃসাহসিক পদক্ষেপের মধ্য দিয়েই যথার্থ আধুনিক নারীরূপে অভিসারিকা শ্রীরাধার পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আত্মনিবেদন মূলক বৈষ্ণবীয় ভাবনার প্রতিচ্ছবি। যেমন শ্রীকান্ত বলছেন—

''তুমি স্বামীর সেবা করতে এসেচ, তোমার লজ্জা কি রাজলক্ষ্মী! ঠাকুরদা, ডাক্তারবাবু এঁদের প্রণাম করো।''[৩৯]

এর সঙ্গেই বৈষ্ণবপদাবলী নিবেদন পর্যায়ে তুলনীয় পদ— যা রাজলক্ষ্মীর পরিপ্রেক্ষিতে প্রযোজ্য—

''পিরীতি রসেতে ঢালি তনু মন
দিয়াছি তোমার পায়।
তুমি মোর পতি তুমি মোর গতি
মনে নাহি আন ভয়।।''[৪০]

তাইতো পরিশেষে বৈষ্ণবতত্ত্ব-দর্শনগত দিক বিচার করে এ কথাই বলা যায় যে— রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে 'প্রেমতত্ত্ব'-এর নিরিখে প্রেমবৈচিত্ত্য, আক্ষেপানুরাগ, মাথুরের যোগসূত্রে, নন্দমিস্ত্রি ও টগর বৈষ্ণবীর মধ্যে পরকীয়া ও ভোগবাদী বৈষ্ণবীর রসতত্ত্বের উপলব্ধিতে, প্রাজ্ঞ মনোহর চক্রবর্তীর মধ্যে ভক্তপ্রাণ রূপে শ্রীকৃষ্ণের পুণ্য সঞ্চয় হেতু আত্মসমর্পণে ও 'কৃষ্ণতত্ত্ব'-এর ছায়াপাত, অভয়ার ব্যর্থ প্রণয় ও বৈষ্ণবীয় আত্মনিবেদনের যোগসূত্রে, এভাবেই শ্রীকান্তের-দ্বিতীয় পর্বে বৈষ্ণবীয় চেতনা উপন্যাসের ধারাবাহিকতাকে অপরূপ বাস্তবতায়, আধুনিক যুগে দাঁড়িয়ে মধ্যযুগীয় পদ সাহিত্যের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করে, বৈষ্ণব তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটকে বহুস্থানে সবলে প্রতিষ্ঠিত

করেছে। ঔপন্যাসিকের ধ্যান ধারণায় এ চেতনা শৈশব থেকেই প্রগাঢ় থাকায় শ্রীকান্তের মধ্যদিয়ে তিনি এই প্রেমগীতিহারকে যথাযোগ্য পাঠকের উপভোগ্য বা সেতুবিধান করেছেন এ কথা স্পষ্ট আঙ্গিকে বলা যায়। পরিশেষে রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্তই যেন রাধাকৃষ্ণের যুগল সম্মিলনের ন্যায় একে অপরের নিকটবর্তী হয়েছেন।

নববিধান (১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দ):

উপন্যাসটি ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হয়। শরৎচন্দ্রের পরীক্ষণমূলক উপন্যাসের অন্যতম প্রমাণ আলোচ্য উপন্যাসটি। কাহিনীতে দাম্পত্য সমস্যাকে সর্বাগ্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। 'নববিধান' উপন্যাসের নায়ক শৈলেশ পেশায় অধ্যাপক এবং আধুনিক সভ্যতায় লালিত অভিজাত পরিবারের এক যুবক। নায়িকা ঊষার সঙ্গে তার বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়, সে একজন প্রাচীন পন্থী ব্রাহ্মণ পরিবারের মেয়ে হওয়ায় স্বামীর সঙ্গে নানা বিষয়ে তার মতানৈক্য তৈরি হয়। উভয়ের দাম্পত্য জীবনের এই অসামঞ্জকর পরিস্থিতির মধ্যে তাদের অভিভাবকের জীবিতাবস্থায় তারা সম্পর্কের ইতিরেখা টানেন। এরপর শৈলেশ দ্বিতীয়বার বিবাহ করে সে বিবাহেও দীর্ঘ আটবছর পর স্ত্রীবিয়োগের মত ঘটনায় শৈলেশ মর্মাহত হন। এমনই সংকটময় পরিস্থিতিতে শৈলেশের তৃতীয় বিবাহের প্রসঙ্গে প্রথমা স্ত্রী ঊষাকে তিনি নিজ গৃহে স্থান দেন এবং ঊষাও তার কর্মদক্ষতায়, আন্তরিকতায় সংসারে তার সর্বময় প্রতিষ্ঠা প্রমাণে সক্ষম হয় ঠিকই, কিন্তু মুসলিম পাচক পুনরায় নিযুক্ত করায় ঊষার হিন্দুয়ানী মানসম্ভ্রমে আঘাত লাগায় সে আপন ভ্রাতৃগৃহে গমন করে ও শৈলেশ সংসার পুনরায় দোদুল্যমান পরিস্থিতিতে আবর্তিত হতে থাকার সময় শৈলেশর গৃহত্যাগী হয়ে এলাহাবাদে গিয়ে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত এবং বৈষ্ণবীয় গুরুবাদ, অধ্যবসায়, কৃচ্ছ্রসাধনের চরম আবর্তে নিজেকে জড়িত করেন এবং ঊষার প্রত্যাবর্তনে সে সকল ইচ্ছার মর্যাদা রাখলেন ঠিকই, কিন্তু বৈষ্ণবীয় আচারের পবিত্রময় আতিশয্য প্রকৃতপক্ষেই কি তাদের দাম্পত্য জীবনের বৈতরণীকে সঠিক পথে চালিত করতে পেরেছে কি না তা জানাই আমাদের অন্বিষ্ট বিষয়। বৈষ্ণব ধর্ম চর্চার নিষ্ঠা ও মান্যতার একটি প্রত্যক্ষ চিত্র কাহিনীকে ত্বরান্বিত করেছে একথা অনুমান করা যায়।

শৈলেশ্বর কলকাতার এক বিখ্যাত কলেজের দর্শনের অধ্যাপক যার বিলাতী ডিগ্রি আছে। দ্বিতীয় স্ত্রীর মৃত্যুর পর ঊষার আগমনে তার কার্যকলাপে সাংসারিক নৈপুণ্যের পাশাপাশি জাতিভেদের প্রবল মান্যতা শৈলেশের বোন বিভার মনকে আহত করে। ঊষা আবদুল নামক এক মুসলিম চাকরকে বিদায় দেন, গিরিধারীকে ছোট জাত বলে বিতাড়িত করেন। এসকল আচরণ

হিন্দু ধর্মীয় আচার আচরণের প্রবল সংস্কার গ্রস্থতার দিক ঊষার মধ্যে লেখক দেখাতে চেয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে ক্ষেত্রমোহন জানান—

''বাস্তবিক শৈলেশ, ব্যাপার কি তোমাদের? চাকরবাকর সব বিদায় করে দিয়ে কি বোষ্টমী বৈরাগী হয়ে থাকবে নাকি?''[৪১]

বৈষ্ণবীয় আচার সর্বস্বতাকে ব্যঙ্গ করে ক্ষেত্রমোহনের মত মানুষ বোষ্টমী-বৈরাগী প্রসঙ্গ টেনে সনাতন হিন্দুধর্ম ও আধুনিক মানসিকতার দ্বন্দ্বে এ যেন এক অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করলেন। ধর্মীয় সংস্কারকে তীব্রভাবে অমান্যের মানসিকতা এ থেকে স্পষ্ট হয়েছে। উপন্যাসের বেশ কয়েকটি ছত্রে বৈষ্ণব ধর্মাশ্রিত মনোভাব বিভিন্ন চরিত্রের আচরণ ও সংলাপের মধ্যদিয়ে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। এই সকল সংলাপে কোথাও হিন্দু ধর্মের প্রতি বিদ্রূপাত্মক, কোথাও বা মাত্রাতিরিক্ত নিষ্ঠার মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে।

১. ''ক্ষেত্রমোহন বলিলেন— ... আমাদের সহধর্মিণী না হলেও চলে। তখনকার লোকের শ্রাদ্ধ-শান্তি, পুজো-পাঠ, ব্রত-নিয়ম, ধর্ম নিয়েই তারা মেতে থাকত, তাদের ছিল সহধর্মিণীর প্রয়োজন।''[৪২]

২. 'বিভা কহিল— জপ-তপ আর হিঁদুয়ানীর সুখ্যাতিতে হঠাৎ যেরকম মেতে উঠেছিলে আমার তো ভয় হয়েছিল। আমরাও মুসলমান-খ্রিস্টান নই, কিন্তু নিজে ছাড়া সবাই ছোট, হাতে খেলে ছুঁলেই জাত যাবে-এ দর্প কেন? হিঁদুয়ানীর গোঁড়ামির শিক্ষা আমরা পাইনি, কিন্তু বাপ মায়ের কাছে যা পেয়েছিলুম সে ঢের সত্য।''[৪৩]

বিভার এ উক্তি যেন সনাতন হিন্দুধর্মের মাত্রাতিরিক্ত শাস্ত্রাচারের বিরুদ্ধে এক দৃপ্ত প্রতিবাদ, ধর্মীয় গোড়ামির ঊর্দ্ধে, ঊষার ধর্মীয় শুদ্ধাচারের নামে জাতিভেদের অহমিকায় সে যেন আপন ব্যক্তিত্বের ধর্মে নয়, ধর্মের পাপাচারকে প্রত্যাঘাত করতে চেয়েছেন এবং শৈলেশকে সুপরামর্শ দিতে চেয়েছেন। ইতিমধ্যে শৈলেশের স্ত্রী ঊষার গৃহত্যাগের পর শৈলেশ ও গৃহত্যাগ করে এলাহাবাদে গমন করলেন—

''এলাহাবাদ হইতে খবর আসিল যে, সোমেনের এই কচি বয়সেই শৈলেশ তাহার পৈতা দিয়াছে এবং নিজেও এক ভক্ত বৈষ্ণবের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে। গঙ্গাস্নান একটা দিনের জন্যেও পিতাপুত্রের বাদ যাইবার জো নাই এবং মাছ মাংস যে পাড়ায় আসে সে পথ দিয়া শৈলেশ হাঁটে না।''[৪৪]

শৈলেশের এ আচরণ, অতিরিক্ত ধর্মপ্রাণতা, আচার সর্বস্বতা তার প্রিয়জনের হৃদয়কে

মর্মাহত করে। কিন্তু তার এই বিবর্তন শুধুমাত্র প্রবল পত্নী প্রেমের প্রাবল্য থেকেই উৎসারিত। এলাহাবাদে গিয়ে যে অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হলেন তা দেখে তার প্রিয়জনেরা স্তম্ভিত প্রায়—

''শৈলেশের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই, সে গুরু ভাইদের সহিত শ্রীগুরুপাদপদ্মে-দর্শনে বৃন্দাবন গিয়াছে, দেখা হইয়াছে সোমেনের সঙ্গে। তাহার শাস্ত্রানুমোদিত ব্রহ্মচারীর বেশ, শাস্ত্র সঙ্গত আচার-বিচার, স্থানীয় একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ আসিয়া সকাল-সন্ধ্যায় বোধ করি ব্রহ্মবিদ্যা শিখাইয়া যান। ... ধর্মের ঝোঁকটাকেই আমি সবচেয়ে ভয় করি।''[৪৫]

শৈলেশের এই উগ্র ধর্মান্ধবোধ, গুরু ভক্তি, সংসার বিবাগী, সর্বত্যাগী, যোগীর মনোভাবে, সোমেনের এই পরিবর্তনে ক্ষেত্রমোহন বিভার মত প্রিয়জনেরা প্রকৃতই চিন্তিত হন। বিভা অধ্যাপক দাদার এ হেন পরিবর্তনে সে বড়ই মর্মাহত হয়। তবে ক্ষেত্রমোহন একটি বিষয়ে আশাবাদী ছিলেন যে, চাকরী সে ছাড়তে পারবে না, গঙ্গাস্নান, ফোঁটাতিলক, শ্রীগুরু, গুরুভাইদের প্রতি তার এই অবস্থায় সামাজিক চাপে তাকে সেখান থেকে জীবনের মূলস্রোতে ফিরে আসতেই হবে। ইতিমধ্যে গৃহে শৈলেশের আগমন ঘটে সেই গোঁসাই বেশে। ক্ষেত্রমোহন লাইব্রেরীতে প্রবেশ করার সময় দেখলেন—

''মেঝের উপর কম্বল ও তাহাতে ফরসা জাজিম পাতিয়া জন দুই নধর পরিপুষ্ট-দেহের সর্বত্র হরিনামের ছাপ মারিয়া, গলায় মোটা মোটা তুলসীর মালা পড়িয়া বসিয়া আছেন, ... ছুটিয়া আসিল সোমেন। ... পরনে সাদা থান, মাথায় মস্ত টিকি, গলায় তুলসীর মালা, সে দূর হইতে প্রণাম করিল, কিন্তু কাছে আসিল না।''[৪৬]

কাহিনীতে শৈলেশের আগমন, সোমেনের বেশভূষা সব কিছুতেই এক বৈষ্ণবীয় সাধকের প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে। সে জানায় তার পিতা প্রভুপদে শ্রীভাগবত পাঠে ব্যস্ত, বিভা, ক্ষেত্রমোহন একপ্রকার অপদস্থ হয়েই শৈলেশের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। দিবারত্রি গোঁসাই নিয়ে তাদের নামকীর্তন অব্যাহত থাকে, এমনকি শৈলেশ শ্রী নবদ্বীপ ধামে একটি গুরুদেবের আশ্রম তৈরীর পর্যন্ত কৃতসংকল্প হয়ে পড়েন, সেই কারণে টাকার ব্যবস্থায় সে ধার পর্যন্ত করতে সংকোচবোধ করে না। কিন্তু এরই মধ্যে ঊষার আগমন হয় সে অতি দ্রুত সোমেনের উদ্দেশ্যে বলেন—

''মালা-ফালা ছিড়ে ফেলে দিয়ে নাপিত ডাকিয়ে চুল কেটে দিই নতুন কাপড় জুতো কিনে আনিয়ে পরিয়ে তবে তার পানে চাইতে পারি।''[৪৭]

এভাবেই উপন্যাসের পরিসমাপ্তিতে ঊষার মধ্য দিয়ে বৈষ্ণবীয় আচারবিচারের ছিন্নমূলকে তিনি আপন পুত্রের শোকে নিজে হাতেই উৎপাটিত করে একটি বিষয় প্রমাণ করে দিলেন যে,

বৈষ্ণবীয় ভক্তিরস প্রেম প্রীতির সমাহারে নির্মিত, তাতে জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা, ছুৎমার্গ এসবের কোন মূল্য নেই, বৈষ্ণবীয় ভক্তিরসে ঈশ্বর সেবার ওপর নাম জীবসেবা, এই বার্তাই কাহিনীর শেষে ঔপন্যাসিক প্রমাণ করতে পেরেছেন। শৈলেশের মত শিক্ষিত যুবক যে বাহ্যিক মোহ, গুরুবাদের ঘূর্ণাবর্তে নিজেকে নিয়োজিত করে— যেভাবে সংসার বিবাগি হয়েছেন, তাতে বৈষ্ণব ধর্মের বাহ্যিক আড়ম্বরের পিছনে মূল ধর্মতত্ত্বটি হারিয়ে গেছে। আপন ধর্মের পথে তিনি পরিবার সহ আপন পুত্রকে জাগতিক সুখ সমৃদ্ধি থেকে বিরত রেখেছিলেন। পরিশেষে উপন্যাসে মানবতাবাদের জয় ঘোষিত হয়েছে। বৈষ্ণবীয় সংস্কার ও বৈষ্ণবীয় মানবত্বের দ্বন্দ্বে ঔপন্যাসিক পরিসমাপ্তিতে ঊষার মধ্য দিয়ে মানবতাবাদের জয় ঘোষণা করে ভক্তিবাদের ঊর্দ্ধে সম্পর্কের মানদণ্ডকে প্রতিপাদ্য রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন। বৈষ্ণবতত্ত্ব-দর্শনের কৃত্রিম আচার সর্বস্বতাকে অতিক্রম করে সরল অনাড়ম্বর জীবনেই যে প্রাণবন্ত প্রকৃত ঈশ্বরের অধিষ্ঠান, এ কাহিনী যেন এরই সাক্ষ্য বহন করে।

শ্রীকান্ত-তৃতীয় পর্ব (১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দ) :

'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের তৃতীয়পর্বটি ১৩২৭-১৩২৮ বঙ্গাব্দের এক পৌষ থেকে ওপর পৌষ পর্যন্ত 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও ১৩২৭ বঙ্গাব্দে চৈত্র, ১৩২৮বঙ্গাব্দে জ্যৈষ্ঠ, শ্রাবণ, কার্তিক, অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়নি। বিশেষত ১৩২৮বঙ্গাব্দে পৌষ সংখ্যার নবম পরিচ্ছেদে অসহযোগ আন্দোলনের যোগসূত্র থাকায় এর প্রকাশনা পাঁচ বার বন্ধ থাকার পর ১৯২৭খ্রীষ্টাব্দে এটি পূর্বের প্রকাশনা সংস্থা থেকেই 'শ্রীকান্ত তৃতীয়পর্ব' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। পর্বটি মূলত গঙ্গামাটির অংশ হিসেবেই অধিক সমাদৃত হয়েছে। উপন্যাসের ক্রমবিবর্তিত কাহিনী ধারার এই পর্বটি যেন চরিত্রের আচরণ, কথোপকথনে প্রতি পদক্ষেপে দর্শককে ভিন্ন ভিন্ন খাতে বাহিত করেছে। শ্রীকান্তের চিন্তাশক্তি, মননশীলতা বৃদ্ধি পেলেও জীবনের ব্যাপ্তবোধে অনেকাংশে লঘু হয়ে উপস্থাপিত হয়েছে। গঙ্গামাটির ক্ষুদ্র সংকীর্ণ পটভূমিতে পরিচিত হওয়া কিছু মানুষের জীবনকেন্দ্রিক সমস্যাই এই পর্বটিকে আলোড়িত করেছে। একদিকে এসেছে সুনন্দার মত তেজস্বিনীর কাহিনী, অন্যদিকে ঔপন্যাসিক বিগত পর্বের নারী মনস্তত্ত্বের তুলনায় এই পর্বের নির্মাণ অত্যন্ত পরিণত মানসিকতার সঙ্গে করেছেন। বৈষ্ণবীয় সংব্যাখ্যান ও তত্ত্বগত পটভূমির প্রতিষ্ঠাদানে উঠে এসেছে ব্রজানন্দ সন্ন্যাসীর মত একটি চরিত্র। যেন প্রেম উন্মত্ত আদর্শে তার সেই বিনম্র শ্রদ্ধা বা ভক্তিচিত্তের পরিচয় উপন্যাসকে অনেকাংশে আবৃত করে রেখেছে, নানা কাহিনীর বিচিত্র বিচরণে রাজলক্ষ্মী স্বমহিমায় অবতীর্ণ হলেও শ্রীকান্তের সঙ্গে তার প্রেম কখনো নিবিড় মাধুর্যকে শুষ্কপ্রায়

করে তোলে, আবার কখনো এরই ফল স্বরূপ শ্রীকান্তের অসহায়ত্ব ও অধীনতাগত কুণ্ঠা পাঠককে তার প্রতি বহুলাংশে সমব্যথী করেছে। উপন্যাসের এই পর্বটির সঙ্গে 'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাসের বহুবিধ সাদৃশ্য ও জীবন সঞ্জাত অভিব্যক্তির সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়েছে। এমনকি এক দৃপ্ত ব্যক্তিত্ব নিয়ে উপন্যাসে আলোকিত হয়েছে রাজলক্ষ্মীর সেবক রতনের মত চরিত্রটি। গঙ্গামাটির নির্জন শুষ্কতায় তার ব্যক্তিত্বের বহু অপ্রকাশিত দিক সেখানে ফুটে উঠেছে।

রাজলক্ষ্মী এক সময় কলকাতার উদ্দেশ্যে গমন করে কিন্তু তার নিবেদিত প্রাণের বার্তা সে শ্রীকান্তের সম্মুখে রেখে যান। শ্রীকান্তও জীবন সমুদ্রে যাবতীয় বন্ধন থেকে মুক্ত হতে বহুবিধ পথের অনুসন্ধান করেছেন। এমনকি সে সন্ন্যাসী হয়েও জীবনকে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। কিন্তু তার সকল প্রচেষ্টাই বৃত্ত বস্তুতে সরলরেখা টানার পরিকল্পনার ন্যায় বারম্বার ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। সে কারণে প্রথম জীবনের উন্মাদনা থেকে পরিণত শ্রীকান্ত আজ তৃতীয় পর্বে দাঁড়িয়েও আত্মনিবেদনের স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন ঠিক এভাবেই—

''আপনাকে সহস্র ধিক্কার দিয়া নিজের দুর্বলতার কাছেই পরাজিত হইলাম, এই কথাটা মনে করিয়া অবশেষে যখন আত্মসমর্পণ করিলাম। .... রাজলক্ষ্মী জাদুমন্ত্র জানে!"[৪৮]

এ জাদুমন্ত্র যেন সত্যই তার সেবায়িত দান, যা রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তের আত্মশক্তি রূপে বারবার তার অন্তরকে শত কোলাহলেও মোহিত করে গেছেন। শ্রীকান্ত যে ছায়া থেকে বের হতে চাইলেও তা সম্ভব হয়নি।

সাইথিয়া স্টেশনে রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে এক সাধুর সাক্ষাৎ হয়। বয়সে খুব বেশি নয়, কুড়ি-একুশ বছর, সুকুমার ও বড়ই সুশ্রী চেহারা, শ্রীকান্ত তাকে দেখে বড়ই বিস্মিত হলেন। ইনি হলেন সাধু ব্রজানন্দ। পরিধানে গেরুয়া বসন বড়ই জরাজীর্ণ। নারীত্বের পবিত্র স্বচ্ছতা ও স্নেহাতুরা আনন্দময়ী মাতৃ মনোভাব থেকে তিনি সাধুজীর সেবা করেন। এই সাধুর সঙ্গেই রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্তের এক পরম ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। রাজলক্ষ্মী প্রাণপন চেষ্টা করে সন্ন্যাসীকে সাংসারিক জীবনে অনুপ্রবেশ করাতে, কিন্তু সন্ন্যাসী দেশের আর্ত, দুর্বল, অসহায়, রুগ্ন, নিরুপায় তথা দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সংস্কারেই নিজেকে সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে উৎসর্গ করেছেন। এভাবে শ্রীকান্তও ধীরে ধীরে ব্রজানন্দ ও রাজলক্ষ্মীর সম্পর্কের অতিগহ্বরে যাওয়ার চেষ্টা করেছে। মূলত সাধু সন্ন্যাস জীবন আবর্তনে জাগতিক সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, মোহ-মায়া এ সকল বিষয়কে তুচ্ছ নগণ্য জ্ঞানে দেশের তথা নিজের আত্মোদ্ধারের পথকেই বেছে নিতে চেয়েছিলেন, ত্যাগের এ পরমবাণী যেন বৈষ্ণবীয় ভোগবিলাস থেকে দূরে ত্যাগ ধর্মের ইঙ্গিত প্রদান করে। এর পাশাপাশি রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে সন্ন্যাসীর

এক বৎসলতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে, যা কাহিনীর ক্রম অগ্রগতিতে পাঠকের বুঝতে অসুবিধা হয় না।

ক্রমশ এই সাধুজী গোমস্তা কাশীরাম কুশারী মহাশয়ের গৃহে আশ্রয় নিলেন এবং রাজলক্ষ্মীর স্নেহধন্য হয়েও এই সুখৈশ্বর্যের মধ্যে বেশিদিন থাকতে চাইলেন না। রাজলক্ষ্মীর কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় সে শ্রীকান্তকে উদ্দেশ্য করে বললেন—

''দেশের সমস্ত মা-বোনের বেদনা যাহাকে টান দিয়া ঘরের বাহির করিয়াছে, তাহাকে একটি মাত্র ভগিনীর স্নেহ, দধির সর এবং মাছের মুড়ো দিয়া ধরিয়া রাখিবে কি করিয়া?''[৪৯]

রাজলক্ষ্মীর এই নিষ্কাম ভ্রাতৃসেবা ও পরোপকারী স্নেহবিগলিত মাতৃমূর্তি স্বরূপা মহিমা বৈষ্ণবীয় ভক্তির নিঃস্বার্থ বাৎসল্য প্রেম, জীবসেবার কৃতিত্বকেই পরোক্ষে স্মরণ করায়। এমনকি মধু ডোমের মেয়ের বিবাহের ক্ষেত্রেও তার এই স্নেহ বাৎসল্যের পরিচয় তাকে প্রায় জগৎ জননীর ভূমিকায় অভিষিক্ত করে।

এরই মধ্যে উপন্যাসে স্থান পেয়েছে সুনন্দার মত একটি আত্মগৌরবে গৌরান্বিত নারী। তার পিতা অধ্যাপক সন্ন্যাসী। পারিবারিক নানা বিপত্তির মধ্যেই চরিত্রটি বিকশিত হয়েছে। শ্বশুর মশাই সন্ন্যাস গ্রহণের দিন তাকে আশীর্বাদ করে বলেন যদি ধর্মের অন্বেষণ জীবনের মুখ্য হয়, তবে ধর্মই মানুষকে সঠিক পথে নিয়ে যাবে। শ্রীকান্ত উপন্যাসে জানিয়েছেন—

''যে কয়টি নারী-চরিত্র আমার মনের উপর গভীর রেখাপাত করিয়াছে, তাহার একটি সেই কুশারীমহাশয়ের বিদ্রোহী ভ্রাতৃজায়া। এই সুদীর্ঘ জীবনে সুনন্দাকে আমি আজও ভুলি নাই। ... সুনন্দা যে একদিন আমাকে দাদা বলিয়া ডাকিয়াছিল তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই।''[৫০]

শ্রীকান্ত সুনন্দাকে পরম আত্মীয়ের মতো কাছে পেয়েছিলেন। সুনন্দা স্বামী সন্তানকে নিয়ে আত্মরক্ষার তাগিদ যে বিদ্রোহিণী প্রতিমূর্তি ধারণ করে, বারম্বার শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষ্মী উভয়কেই ভাবিত করে। জীবনের সকল সুখের অনুসন্ধান সে ঈশ্বরের চরণে সমর্পণের মধ্য দিয়েই লাভ করতে প্রয়াসী হয়েছেন। যতদিন অতিবাহিত হতে লাগল সুনন্দা তন্ত্র মন্ত্রের উচ্চারণ ও আত্মশুদ্ধির মধ্যে দিন কাটাতে লাগলেন, এ সাধনায় তার দিনান্তেও কোন বিরাম ছিল না। শ্রীকান্ত তার ধর্মতত্ত্ব জ্ঞান অপেক্ষা তার পরির্তনকেই অধিক দৃষ্টিপাত করতে লাগলেন। সুনন্দার এই ধর্মশাস্ত্র আচার-বিচার তাকে একপ্রকার সাধিকার পর্যায়ে উজ্জীবিত করে। এই সুনন্দার সংস্পর্শেই রাজলক্ষ্মীর ব্যক্তিগত জীবনও সেই সাধনার পথে অগ্রসর হতে থাকে। শ্রীকান্তের প্রতি তার সকল ব্যাকুলতা, নারী হৃদয়ের নিঃশেষিত স্নেহ সম্পদ উজাড় করে দিলেও সুনন্দার ধর্মপ্রাণাগত প্রভাব তার মধ্যে

ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হতে থাকে। শ্রীকান্ত আপন অবচেতনে উদ্ধৃত করে—

''রাজলক্ষ্মীর ধর্মে মতি হোক, তাহার বক্রেশ্বরের রাস্তা সুগম হোক, তাহার মন্ত্রোচ্চারণ নির্ভুল হোক, আশীর্বাদ করি তাহার পুণ্যার্জনের পথ নিরন্তর নির্বিঘ্ন ও নিষ্কণ্টক হোক, আমার দুঃখের ভার আমি একাই বহন করিব।''[৫১]

অর্থাৎ সুনন্দার অন্তর্বেদনার সঙ্গে রাজলক্ষ্মীর যে সমবেদনাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তাতে তাদের মধ্যে একপ্রকার পদাবলীর 'সখীতত্ত্ব'-এর আলেখ্যে আধ্যাত্মিকার রূপচিত্র প্রকাশিত হয়েছে। যেখানে তারা প্রেমাষ্পদের ঊর্দ্ধে পরমব্রহ্মের নিবিড় সঙ্গ লাভের জন্যই ধর্মাচরণের পথে ক্রমশ নিজেদের আত্মস্থ করেছেন।

উপন্যাসের অন্তিমে পুনরায় ব্রজানন্দের উপস্থিতি ঘটে। সন্ন্যাসী হবার পূর্বে ডাক্তারি বিদ্যায় পারদর্শী থাকায় সে দেশে তথা জীব সেবায় যেভাবে আত্মনিয়োগ করে, তাতে শ্রীকান্তের মনে তার প্রতি সকল কুহেলিকার অপসারণ ঘটে। শ্রীকান্তের গঙ্গামাটির বহু অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ জীবনকে ত্যাগ করার সময় তার একটি কথাই মনে হয়। প্রেমের প্রতি যে অবিচলিত নিষ্ঠা ও ভক্তির অর্ঘ্যে রাজলক্ষ্মী তার বাঈজী জীবনকে অতিক্রম করে স্বধর্মাচরণের মধ্য দিয়ে অভিষ্ট বস্তুর সেবা করতে চেয়েছিলেন তা কোথাও যেন বৈষ্ণবীয় তত্ত্বে রামানন্দ ও চৈতন্যদেবের কথোপকথনে উঠে আসা 'সাধ্যসাধন তত্ত্ব'-এর সঙ্গে অনেক সংগতিপূর্ণ। তার প্রাচুর্য্যের জীবনে সে চাইলেই তার সেই আভিজাত্যের বেষ্টনীকে অবলম্বন করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা বেছে নেননি, অপূর্ণ প্রেমাস্পদকে আপন অন্তরে, প্রীতির ঔদার্য্যে ত্যাগের মধ্য দিয়ে মহিমান্বিত করেছেন। উপন্যাসের অন্তিম অংশে যখন রাজলক্ষ্মী গুরুদেবের নিকট দীক্ষা নিতে চাইলেন তখন শ্রীকান্ত আপন অন্তরের দোলাচলতার মধ্য দিয়েই রাজলক্ষ্মীকে সুখী থাকার আশীর্বাদ জানিয়েছেন। বিদায়ের নিঃসঙ্গ পালায় গঙ্গামাটির স্মৃতি বিজড়িত নয়নে সে অনুভব করে, রাজলক্ষ্মী যে তার জীবন তরণীর অদৃশ্য অতল রেখাতটে নোঙর ফেলতে পারবে না, তারই যেন অব্যক্ত যন্ত্রণাকে উচ্চারণ করে গেল।

তাইতো পরিশেষে রাজলক্ষ্মীর জীবনযুদ্ধ যেন বৈষ্ণবীয় 'সাধ্য-সাধনতত্ত্ব'-এর দিকটিকেই ইঙ্গিতে প্রতিকায়িত করেছে। এই বৈষ্ণবীয় সাধনতত্ত্বে নর-নারীর পৃথক সত্তা বিলুপ্ত হয়ে তারা এক অভিন্ন আত্মায় পরিণত হয়। এই সত্তার বিলুপ্তিই নারীর আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে তার স্বধর্মের বিকাশ ঘটান। রাজলক্ষ্মীর মধ্যে এরূপ ত্যাগের মহিমায় উন্নত আদর্শের, প্রকৃত অর্থে স্বধর্মাচরণের প্রতিবিম্ব প্রস্ফুটিত হতে দেখা যায়। এই আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে শ্রীকান্তের মঙ্গলার্থে সে শ্রীকান্তের

সঙ্গে বিচ্ছেদকেও স্বীকৃতি দিতে বিন্দুমাত্র পিছপা হননি। কিন্তু এই ত্যাগে সাময়িক অভিমান বিচ্ছেদ যন্ত্রণা নিহিত থাকলেও আন্তরিক বন্ধনে রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তকে কোনভাবেই বিস্মৃত হতে পারেনি, প্রিয় ব্যক্তিকে কাছে পাবার এই সাধনায় রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তের প্রতি সশ্রদ্ধ প্রেমের পুষ্পাঞ্জলি নিবেদনে এভাবেই বৈষ্ণবীয় সাধনে তত্ত্বের নিবিড় যোগসূত্র উপলব্ধি করা যায়। তাইতো যে চোখের আড়াল থেকে দূরে চলে যায়, সেই পুরুষই সেই নারীর মর্মমূলে চিরদিনের মত অধিষ্ঠিত হয়ে থাকে। হয়ত এটিই নারীর নির্মম নিয়তি, যা রাজলক্ষ্মীর স্বল্প জীবন পরিধিতে আপন নিয়তির জোরে প্রকৃত রসোসমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে একথা স্পষ্টভাবে বলা যায়।

উপন্যাসের বহু বিচিত্র কাহিনীর গতিপথে বৈষ্ণবীয় রসতত্ত্বগত অনুষঙ্গের প্রসঙ্গ এভাবেই শ্রীকান্তের আত্মকথন মূলক উপলব্ধিতে উঠে এসেছে। সেকারণেই উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদে গোপাল আরাধনার একটি প্রসঙ্গ টেনে শরৎচন্দ্র মানব ও দেবত্বের উপলব্ধিকে স্বীকৃতি দিয়েছেন—

''এমনিই ঘরে ঘরে তখন শাঁখ বাজিতে আরম্ভ করিয়াছিল, এমনিই বসুমল্লিকদের গোপাল-মন্দির হইতে আরতির কাঁসরঘন্টার রব অস্পষ্ট হইয়া বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল। তথাপি সেদিনের সঙ্গে আজিকার প্রভেদটা যে কত বড়, সে কেবল আকাশের দেবতারাই দেখিতে লাগিলেন।''[৫২]

এভাবেই বাংলার নগণ্যপল্লীর জীর্ণ ভগ্ন গৃহের প্রতি মমত্বকে বিসর্জন দিয়ে শ্রীকান্ত যে সর্বত্যাগী যাত্রাপথে এগিয়ে যেতে চান তার ইঙ্গিত কাহিনীর প্রথম থেকেই স্পষ্ট করেছেন। বসুমল্লিকদের গোপাল বন্দনার আরতি, শ্রীকান্তের রাজলক্ষ্মী ও ব্রজানন্দ সন্ন্যাসীর সম্পর্কের আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও দেশের পরিপ্রেক্ষিতগত সমীকরণ নির্ণয়ে, সুনন্দার মত সকল মোহত্যাগী ধর্মসাধনার এক অপরূপ গণ্ডী নির্মিত নারীর জীবনাচরণে এবং সর্বোপরি শ্রীকান্তের একাকিত্ব জীবনের নতুন পৃথিবীতে পাড়ি দেওয়ার সংকল্পে ও রাজলক্ষ্মীর নিবেদিত চিত্তে শ্রীকান্তকে পাবার 'সাধ্য-সাধন' প্রসঙ্গে আমরা বৈষ্ণবীয় ভাবমূর্তি রচনার বহু চিহ্ন উপন্যাসের মধ্য থেকে পরিলক্ষিত হতে দেখি। পরবর্তী পর্বে এই ভাবনার আরো সুক্ষতর বিশ্লেষণ উঠে আসবে বলেই অনুমিত হয়। এভাবেই শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মীর সম্পর্ক স্বামী-স্ত্রীর অনুরূপ হয়েও তা সকল শারীরিক আসক্তিকে অতিক্রম করে যে ত্যাগের পথকে অনুসরণ করে, তাতেই এর গভীর ব্যঞ্জনা পাঠকচিত্তকে আগামী পর্বে মনোনিবেশে স্বতঃপ্রাণোদিত করে।

শ্রীকান্ত— চতুর্থ পর্ব (১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দ) :

'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের সর্বশেষ ও চতুর্থ পর্বটি ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাস থেকে ১৩৩৯

বঙ্গাব্দের মাঘ মাস পর্যন্ত 'বিচিত্রা' পত্রিকায় 'শ্রীকান্ত-চতুর্থ পর্ব' নামে প্রকাশিত হয় এবং এর বারোটি সংখ্যাকে নিয়ে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের চতুর্থ পর্বটিও প্রকাশ করে ফেলেন পূর্বের প্রকাশনা সংস্থা থেকেই। পরবর্তীকালে এর পঞ্চম পর্ব প্রকাশিত করার মনোবাঞ্ছা থাকলেও তাঁর এই পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত হয়নি।

শ্রীকান্তের চতুর্থ পর্বটিই এই উপন্যাস পর্ব সমূহের মধ্যে বৈষ্ণবীয় তত্ত্বগত পরিমণ্ডল নির্মাণ সর্বাধিক প্রত্যক্ষ ভূমিকা নিয়েছে। বন্ধুপ্রীতি, প্রেমালেখ্য রচনার পুরাতনী পরিবেষ্টনীর মধ্যেই নব নব আলোক মহিমায় অংশটি প্রজ্জ্বলিত হয়েছে। এসেছে গহর ও কমললতার মত চরিত্র, যারা উপন্যাসের গতিপথে নানা সমীকরণের পূর্ণতা দিয়েছেন। এক করুণ সাহিত্য রচনার সূত্র ধরেই গহরের সঙ্গে শ্রীকান্তের প্রীতিপূর্ণ বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে, গহরের সাহিত্যচর্চা শ্রীকান্তের জীবন তন্ময়তার বহু দুর্ভেদ্য রহস্যের সঙ্গে এমন ভাবে মিলিত হয়েছে যে স্বাভাবিক ভাবে গহরের প্রতি শ্রীকান্তের এক সহানুভূতির জন্ম হয়। এই গহরের সন্ধানরত অবস্থায় উপন্যাসে সবচেয়ে প্রভাবিত ও আলোড়িত চরিত্র রূপে কমললতার সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাতেই অজানা বিস্ময়বোধ শ্রীকান্তকে আচ্ছন্ন করে। নারী হৃদয়ের প্রবল নৈতিক সংস্কারে, সাধনার এক বিশেষ মার্গে কমললতার এই উপস্থিতি উপন্যাসে এমন এক ভাব তন্ময়তার সৃষ্টি করে যা তার অন্তর্জীবনকে এক নিমেষেই শ্রীকান্তের নিকট উন্মুক্ত করে। এভাবেই উপন্যাসের অন্তিমপর্বে নতুন চরিত্রের সমাগম, বৈষ্ণবীয় পরিমণ্ডল, তাদের চরিত্রদীপ্তি কাহিনীর মূল গতিপথকে নিয়ন্ত্রিত করেছে।

উপন্যাসের প্রথমেই শ্রীকান্তের জীবনে কুমার সাহেবের শিকার পার্টিতে প্রথম বারের মতো পিয়ারী/রাজলক্ষ্মীর সাক্ষাৎ স্মৃতি তাকে ভাবতন্ময়তার যুগে নিয়ে যায়। জীবনের নানা চড়াই-উৎরাই অতিক্রম করে শ্রীকান্ত আবার কলকাতার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছেন, তার বাসনা একদিন সে আবার বর্মায় ফিরবেন। এই স্টেশনেই তার গহরের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয়। সে শ্রীকান্তের পাঠশালার বন্ধু। তবে গহরের মধ্যে বাল্যকাল থেকেই এক কবিসত্তা বিদ্যমান ছিল, সে ছোট থেকেই নানাবিধ শাস্ত্রচর্চা, পাঁচালী, কৃত্তিবাসী রামায়ণ সহ নানা শাস্ত্রে বেশ দক্ষ ছিল। বর্তমানে গহররা মুসলিম ফকির সম্প্রদায়ের লোক। তার পিতামহ বাউল, রামপ্রসাদী অন্যান্য গান গেয়ে ভিক্ষাবৃত্তি করতেন। পৈতৃক বৃত্তি তেজারতিও পাটের ব্যবসা সহ তাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা যথেষ্ট পরিমাণেই বিদ্যমান ছিল। তার বাড়িতে শ্রীকান্ত কিছুদিনের জন্য আশ্রিত হলেন, আপন কাব্য সাধনার তন্ময়তা গহরের গৃহে অতিথি আগমনের বিষয়টিকেও ছাপিয়ে ওঠে। গহরের নানাবিধ কাব্যচর্চার মধ্যেও শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীকে বিস্মৃত হয়না, তাকে গহরের বাড়ি থেকে শেষ চিঠি খানি

লিখে ফেলেন। রাজলক্ষ্মীর পালিত বঙ্কুও এখন একুশ বছরের যুবকে পরিণত হয়েছে। তবুও এই দীর্ঘ জীবনে সর্বস্ব ত্যাগিনী রাজলক্ষ্মীর হৃদয়ে শ্রীকান্তের প্রতি অব্যক্ত প্রেমকে সে আজও অনুভব করে। প্রেমের আতিথ্য ছাড়াই শ্রীকান্তের এমন এক নারী সাহচর্যকে সে অনেকটা সৌভাগ্য বলেই বোধ করে। সে কারণেই তপস্বিনী, রাধিকার একাকী নির্জন নির্বাসনে শ্রীকৃষ্ণের অপেক্ষমান চিত্রকল্পের সঙ্গে শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীর কাহিনীকে এভাবেই যুক্ত করেন—

''বীরভূম জেলার সেই তুচ্ছ কুটীরখানি মনের উপর ভূতের মত চাপিয়া বসে, অনুক্ষণ গৃহকর্মে নিযুক্তা রাজলক্ষ্মীর স্নিগ্ধ হাত-দুটি চোখের উপর স্পষ্ট দেখিতে পাই, এ জীবনে পরিতৃপ্তির অস্বাদন এমন করিয়া কখনো করিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না।''[৫৩]

এই উক্তির মধ্য দিয়েই শ্রীকান্তের হৃদয়ে রাজলক্ষ্মীর প্রতি অব্যক্ত স্নেহের সহানুভূতিপূর্ণ পরিতৃপ্তির বাণী সেভাবে অনুভূত হয়েছে, তাতে অনেকক্ষেত্রেই তা জ্ঞানদাসের

''রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।।''[৫৪]

পদটিকেই অনুষঙ্গে স্মরণ করিয়ে দেয়। অর্থাৎ পদটিতে যেমন প্রিয় প্রিয়ার বিহনজাত বেদনাকে প্রতিপাদ্য করে তাদের প্রেমময় ব্যঞ্জনাকে লিরিকের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। ঠিক সেই প্রকার মন্দ্রিত ভাবানুভূতিই রাজলক্ষ্মীর স্মরণে শ্রীকান্তের মনে বিচরণ করেছে। রাজলক্ষ্মীর সকল দুর্বল স্থানকে আজ বুঝতে পেরে তার গুরুভক্তি, জপতপ-ব্রত-উপবাসকেই শ্রীকান্ত সাদরে স্বীকৃতি জানিয়েছেন।

একদিন গহরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে শ্রীকান্ত নবীন নামক একটি ছেলের কাছে থেকে জানতে পারেন যে, গহরও বোষ্টমী বেটিদের আড্ডার সময় অতিবাহিত করেন। নবীনের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যে শ্রীকান্ত জানতে পারেন—

''বুড়ো মথুরাদাস বাবাজী ম'লো, তার জায়গায় এসে জুটল এক ছোকরা বৈরাগি, তার গণ্ডা-চারেক সেবাদাসী। দ্বারিকদাস বৈরিগীর সঙ্গে আমাদের বাবুর খুব ভাব, সেখানেই ত প্রায় থাকেন। ... ওরা জাতজন্ম কিছুই মানে না, যে-কেউ ওদের সঙ্গে মিশলেই ওরা দলে টেনে নেয়, বাচবিচার করে না। ... দ্বারিক বাউল গান বাঁধিতে, ছড়া রচনা করিতে সিদ্ধহস্ত। গহর এই প্রলোভনে মজিয়াছে। ... আর কমললতা একজন যুবতী বৈষ্ণবী— এই আখড়াতেই বাস করে। সে দেখিতে ভালো, গান গাহে ভালো, তাহার কথা শুনিলে লোকে মুগ্ধ হইয়া যায়। বৈষ্ণব সেবায় গহর মাঝে মাঝে কাটাকড়ি দেয়, আখড়ার সাবেক প্রচীর জীর্ণ হইয়া ভাঙিয়া গিয়াছিল; গহর নিজ ব্যয়ে তাহা মেরামত করিয়া দিয়াছে। ''[৫৫]

এভাবেই উপন্যাসের এই পর্বে মহাপ্রভুর শিষ্য ভক্ত নির্মিত আখড়ায় বৈষ্ণবী কমললতার প্রথম পরিচয়ের মধ্য দিয়ে বৃন্দাবন লীলার এক অভূতপূর্ব পরিবেশের সান্নিধ্যে আসেন শ্রীকান্ত। তার মনে সে আখড়ায় যাবার স্পৃহা জেগে ওঠে এবং মনের অদম্য ইচ্ছাশক্তিকে সঙ্গী করে, নবীনের এক প্রকার অনিচ্ছাকে অস্বীকৃত করেই, তিনি সরাসরি উপস্থিত হলেন সেই বৈষ্ণব আখড়ায়। গহরের অনুসন্ধানে গিয়ে তার অবচেতনে কমললতাকে দর্শনের ইচ্ছাই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল। কমললতার প্রসঙ্গে তিনি বললেন—

''কমললতা, এতদিন ছিলে কোথা? কমল এসে সেই যে আপনার হ'ল তার আর আদি-অন্ত-বিরহ-বিচ্ছেদ রইল না। এই সাধনা গোঁসাই, একেই তো বলি রসের দীক্ষা।''[৫৬]

এই দুটি উদ্ধৃতি থেকেই বৈষ্ণবীয় ধর্মের ধর্ম নিরপেক্ষ দিক প্রতিভাত হয়েছে। যেখানে সকল শ্রেণির মানুষকেই জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সাদরে গ্রহণ করা হয়। তাদের সেবামূলক মনোভাবই মুখ্য এবং পরবর্তী উদ্ধৃতিতে কমললতার মত যুবতী বৈষ্ণবী আদি-অন্ত বিরহের মধ্যে সেতুবন্ধন করে, শ্রীকান্তের মত যুবককে রস দীক্ষায় দীক্ষিত করে পরিতৃপ্ত করতে পারার ইচ্ছায় অর্থাৎ এক প্রকার বৈষ্ণবীয় পরকীয়া তত্ত্বের ইঙ্গিত চরিত্রের প্রথম আগমনকাল থেকেই প্রকাশিত হয়। এমনকি কমললতার অভিভাবক বাবাজীর মধ্যেও শ্রীকান্ত একপ্রকার উন্মাদগ্রস্ত, কবিতা ও বৈষ্ণব রসচর্চার কিঞ্চিৎ বিভ্রান্তিকর বিষয়ও লক্ষ করেন। আপাত সহজ-সরল বাবাজী শ্রীকান্তের দৃষ্টিতে এক প্রকৃত ধর্মসাধক রূপেই পরিগণিত হয়েছে। কমললতার সঙ্গে প্রথম কথোপকথনে তার প্রতি একপ্রকার মুগ্ধতা শ্রীকান্তর মনে প্রথম থেকেই লক্ষিত হয়েছে, তাদের গতিবিধি, কাজ-কর্মের প্রতি অত্যধিক আগ্রহ ক্রমশ শ্রীকান্তকে কমললতার নিকটবর্তী করে তোলে। শ্রীকান্ত একস্থানে বলেন—

''একাকী বসিয়া অন্যান্য বৈষ্ণবীদের কাজ দেখিতে লাগিলাম। ... মিনিট-দশেক পরে কমললতা যখন ফিরিয়া আসিল তখন কাজ শেষ করিয়া সকলে উঠিয়া গেছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমিই এই মঠের কর্ত্রী নাকি?

কমললতা জিভ কাটিয়া কহিল, আমরা সবাই গোবিন্দজীর দাসী— কেউ ছোট-বড় নেই।''[৫৭]

অর্থাৎ শ্রীকান্তর কমললতার প্রতি প্রথম কৌতূহল নিবৃত্তির সময়, কমললতার মানসিকতা থেকে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তার সমর্পিত চিত্ত অর্থাৎ গোবিন্দজীর কাছে নিজেকে দাস রূপে তাঁর চরণে আত্মপ্রদানের পরিতৃপ্তির কথা অত্যন্ত স্বল্প বক্তব্যে, গভীর বৈষ্ণব তত্ত্বগত ব্যঞ্জনায় উপস্থাপন করেছেন। কমললতার মত ভক্তরা নিজেকে গোবিন্দজী অনুগ্রাহ্য মনে করেন। কৃষ্ণই তাদের

কাছে পরম আরাধ্য দেবতা— শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এই প্রীতিপূর্ণ মনোভাব থেকেই জন্ম হয় প্রভু ও দাস রূপ সম্পর্কের ঐশ্বর্যবাণী। শ্রীকৃষ্ণের কাছে তারা অত্যন্ত দীন ভক্ত রূপে সেবা নামক স্থায়ী রতি ভাবে ভগবানকে তুষ্ট করতে চান। ঠিক যেভাবে বৈষ্ণব কবি নরোত্তম দাস বলেছিলেন 'সেবা দিয়া কর অনুচর।' 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এ এই দাস্যভাবকেই প্রেমভক্তি মার্গের প্রথম পদক্ষেপ রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে কমললতার জীবনাদর্শ ও ভক্তি ভাবনাকে কৃষ্ণ প্রাণাগত সেবিকা রূপে উপন্যাসে তার প্রথম আগমনের সময় থেকেই অনুধাবন করতে পারি।

জীবন ধারণের জন্য ভিক্ষাবৃত্তিই সহজিয়া বৈষ্ণবদের একমাত্র পথ। তাদের দৈনন্দিন জীবনের রাঁধা-বাড়া, জল তোলা, কুটনো-বাটনা, মালা-গাঁথা, কাপড়-ছোপান— এসকল কাজই তাদের সাধ্য-সাধনার অঙ্গরূপে কমললতা চিহ্নিত করেন। কমললতার কথার মধ্য দিয়ে শ্রীকান্ত এক নব আনন্দিত জীবন জোয়ারের পদধ্বনি আপন জীবনে অনুভব করেন। বৈষ্ণবদের জীবনকে তিনি পরম আনন্দময় রূপে চিহ্নিত করে নিজেও সেই সুখ সমুদ্রে পাড়ি দিতে আগ্রহী হলেন। শ্রীকান্ত যখন শ্রবণ করলেন—

''মন্দিরা-সহযোগে কীর্তনগান কানে গেল, ... গানের কথাগুলি যেমন মধুর তেমনি সুস্পষ্ট। বামাকণ্ঠ রমণীকে চোখে না দেখিয়াও নিঃসন্দেহে অনুমান করিলাম, এ কমললতা।''[৫৮]

এভাবেই কমললতার বৈষ্ণবীয় ব্যক্তিত্ব, প্রতিভা, স্নেহ শ্রীকান্তকে উত্তরোত্তর আবৃষ্ট করতে লাগল। বিশেষত কমললতার রাধাকৃষ্ণের যুগল সম্মিলিত যে মূর্তি সম্মুখস্থ সংগীত শ্রীকান্তকে মোহিত করে তা হল—

''মদন-গোপাল জয় জয় যশোদা-দুলাল কি,
যশোদা-দুলাল জয় জয় নন্দদুলাল কি,
নন্দদুলাল জয়জয় গিরিধারী-লালকি,
গিরিধারী-লাল জয় জয় গোবিন্দ-গোপালকি—''[৫৯]

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এই ভাবতন্ময়তা সকল বৈষ্ণবদের অশ্রুসিক্ত করে তার ধারা শ্রীকান্তের হৃদয়কেও তারই অবচেতনে ক্রমশ বিগলিত করতে থাকে, আখড়া সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে যে হেয় তুচ্ছ কুরুপা প্রতিচ্ছবি শ্রীকান্তের মনে প্রোথিত ছিল। তা কমললতার মত নারীর সংস্পর্শে চূর্ণ হয়ে গেল। কিন্তু শ্রীকান্ত ভাবের এই তন্ময়তাকে ভয়ও করতেন। কমললতা একজন বৈষ্ণব সাধিকা হয়েও অন্তর সৌন্দর্যে, বুদ্ধিমত্তায়, হৃদয়ের পবিত্রতায় প্রকৃত অর্থেই কৃষ্ণ সাধিকা হয়ে ওঠেন। তার পারিপাট্য শ্রীকান্তকে এক অচেনা মোহগ্রস্ততায় আচ্ছন্ন করে রাখতে সক্ষম হয়।

পরদিন প্রত্যুষে মঙ্গল আরতির সময় আরো একটি সংগীত তার হৃদয় স্পর্শ করলো—

''কানু-গলে বনমালা-বিরাজে, রাই-গলে মোতি সাজে।
অরুণিত চরণে মঞ্জীর-রঞ্জিত খঞ্জন গঞ্জন লাজে।''[৬০]

এভাবেই কৃষ্ণসেবার এক পবিত্র অঙ্গনে অষ্টপ্রহর ব্যাপী অফুরন্ত সেবাই কমললতার কাছে প্রভুভক্তির সমতুল্যতা পেয়েছে। রাধাকৃষ্ণের অঙ্গসজ্জা থেকে তাদের চরণসেবাই এই সংস্কৃতির প্রকৃত ভজন ধর্ম। কমললতার আকর্ষণে তাদের সান্নিধ্যে থাকার বাসনায় শ্রীকান্তের হৃদয়ে এক অচেনা দোলাচলতার সৃষ্টি করে। এরই মধ্যে কমললতার বিরুদ্ধে চরিত্রহীনতার অভিযোগ এনে এক অচেনা ব্যক্তি শ্রীকান্তের মনকে উন্মনা করে তোলে। ঘরে রাখা বৈষ্ণব ধর্মশাস্ত্র গ্রন্থের মধ্য থেকে একটু পড়বার চেষ্টা করলেও মনসংযোগ করতে পারলেন না। কিন্তু শ্রীকান্তের প্রতি কমললতার মনে যে সুপ্ত প্রণয় বাসনা, সেটা বুঝতে তার বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয় না— একটি স্বাভাবিক কথোপকথনে কমললতা বললেন—

''সবে কাল সন্ধ্যায় ত তুমি এসেছো, কিন্তু আজ আমার চেয়ে বেশি এ সংসারে তোমাকে কেউ ভালোবাসে না। পূর্বজন্ম সত্যি না হলে এমন এমন অসম্ভব কাণ্ড কি কখনো একটা দিনের মধ্যে ঘটতে পারে! ... এত অল্পকালে এমন স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল ভাষায় রমণীর প্রণয় নিবেদনের কাহিনী ইহার পূর্বে কখনো পুস্তকেও পড়ি নাই, লোকের মুখেও শুনি নাই।''[৬১]

নারীর প্রেমতত্ত্বের গভীরতম আর্তিতে এ আত্মনিবেদনের সুর মূর্চ্ছনায় শ্রীকান্ত বারম্বার শিহরিত হলেন। প্রকৃতপক্ষে বৈষ্ণব সাধনার পরিমণ্ডলে যারাই বিরাজ করেন প্রত্যেকের অন্তরেই এক গভীর ঘনীভূত প্রেম বিরাজমান। মুক্ত পুরুষ রূপে যে শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীর মত নারীর মোহমায়াকে ছিন্ন করে বারবার একা থাকতে চান, সেই শ্রীকান্তের জীবনেই ঘটনাচক্রে আত্মনিবেদিত প্রেমের জোয়ার ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চায়, তার এই আপাত ভয়, প্রেম বিতৃষ্ণার মধ্যেই প্রেমস্পৃহা নিহিত আছে, তা সে নিজেও উপলব্ধি করতে পারে না। শ্রীকান্তের এই লক্ষ্যহীন, অনাসক্ত, আত্মবিস্তৃত ভাব তন্ময়তার মধ্যেই কমললতার সেই প্রেমবাণী তার মর্মমূলকে নাড়িয়ে দিয়েছে। কমললতা যেন কৃষ্ণদাসী শ্রীরাধার রূপেই শ্রীকান্তের নিকট যে প্রাঞ্জল ভাষায়, কথায়, গানে, যত্নে, আতিথ্যে, আন্তরিকতায় প্রশান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি করেছে তেমনি বৈষ্ণবী রূপে তার আবেদনে, অশ্রুমোচনে, মাধুর্য্যের অকুণ্ঠিত প্রকাশে শ্রীকান্তের মনকে অজানা আশঙ্কায় এই এক প্রকার তিক্ততার জগতে নিয়ে যায়—

''কেবল লজ্জাতেই যে সর্বাঙ্গ কন্টকিত হইল তাই নয়, কি-একপ্রকার অজানা বিপদের

আশঙ্কায় অন্তরের কোথাও আর শান্তি-স্বস্তি রইল না।”[৬২]

এ আশঙ্কার সঙ্গে চণ্ডীদাসের শ্রীরাধার হৃদয়-মোহিত বাণীর সাদৃশ্য পাওয়া যায়—

‘‘গোকুল নগরী মাঝে এতেক রমণী আছে
তাহে কেন পড়িল না বাঁধা,
নিরমল কুলখানি যতনে রেখেছি আমি—
বাঁশী কেন ডাকে ‘রাধা, রাধা’?”[৬৩]

শ্রীরাধার আক্ষেপের সুরেই যেন কমললতার হৃদয় শূন্যতার সাদৃশ্য লক্ষিত হয়েছে। আক্ষেপ জনিত এই তত্ত্বটির ক্ষেত্রে কমললতার সঙ্গে শ্রীরাধার প্রণয় মহিমার সূত্র একই গণ্ডিতে বাধা পড়েছে। পদাবলী সাহিত্যে তাই মিলন অপেক্ষা যেন বিরহ বেদনার মূর্চ্ছনাই পাঠককে বারম্বার আকৃষ্ট করেছে। শ্রীকান্তও নিজেকে যে পরমযত্নে এতদিন আত্মরক্ষা করেছেন কমললতার আবেদনে তা যেন আর রক্ষা করা সম্ভব নয়, তাইতো বৈষ্ণবী সম্পর্কে শ্রীকান্ত মনে করেন এ নারী যেন রসের আরাধনায় মগ্ন থাকার পরেও নারী প্রকৃতির স্বভাব জাত বৈশিষ্ট্যে রসতত্ত্বের সন্ধান পাননি, সেই অসহায় অপরিতৃপ্ত বোধের নিরবচ্ছিন্ন ভাব-বিলাসের উপকরণ সংগ্রহে, আজ সে হয়ত শান্ত-দ্বিধায় জর্জরিত। বৈষ্ণবী সেই অনন্ত সখ্যতার রস সন্ধানের চেষ্টায় আজও পথ খুঁজে বেড়াচ্ছেন। বৈষ্ণবী রসতত্ত্বে অহংকার বিনাশের পন্থা যেমন দেখানো হয়েছে, ঠিক তেমনি গোপন প্রেমকে বিনয় সহ সমর্পণের মধ্য দিয়ে আত্মসুদ্ধি বা প্রায়শ্চিত্ত্যের বিধানও দেওয়া হয়েছে। কমললতার দৃষ্টিতে যে আত্মগ্লানির নির্বাক ধ্বনি শ্রীকান্ত অনুধাবন করে, তা থেকেই তার আন্তরিক নিষ্ঠার সমীহ বারম্বার মুক্তি পেতে চাইলে, ততই সে আবর্তনে নিজেকে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ফেলেন। এ যেন মনের মানুষকে কাছে পাবার নিরন্তর সাধনা। যে কণ্টকিত পথে কমললতার মত সর্বত্যাগী বৈষ্ণবী যথার্থই রাধাভাবে ভাবিত হয়ে, আপন হৃদয়পথকে ক্ষণিকের সাক্ষাতে শ্রীকান্তের চরণে নির্দ্বিধায় অর্পণ করতে পেরেছিলেন।

এই কমললতাই প্রথম যৌবনে মন্মথের মত এক স্বার্থপর পুরুষকে হৃদয় দিয়েছিল। তার পিতাও নিষ্ঠাবান শান্তপ্রকৃতির বৈষ্ণব হওয়ায় নবদ্বীপে এসে মন্মথর সঙ্গে তাকে বিবাহ দিতে উদ্যোগী হলেন, তখন কমললতা মন্মথরই গর্ভস্থ সন্তানের জননী হতে চলেছেন, কিন্তু নিয়তির নির্মম পরিহাসে মন্মথ ঊষা নামক এক নারীর সংস্পর্শে তাকে ত্যাগ করে, কমললতাও এক মৃতপুত্র সন্তান প্রসব করে। এরপর থেকেই তার জীবনে বৈষ্ণবীয় সাধন প্রণালী ও ঈশ্বর সেবার মনোভাব প্রগাঢ় হতে শুরু করে। পরকীয়া সাধনায় নিজেকে কৃষ্ণদাসী রূপে নিমজ্জিত করে আজ

সে বৈরাগীর জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। যে সাধনার পথ তাকে মুক্তির দিকে নিয়ে গেছে। শ্রীকান্তও ক্রমশ নিজেকে কমললতার সংস্পর্শ থেকে মুক্তি পথের অনুসন্ধান করতে লাগলেন।

''স্থির করিলাম, ঘুমানো হইবে না, ঠাকুরের মঙ্গল-আরতি শুরু হইবার পূর্বেই অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়া প্রস্থান করিব।''[৬৪]

কিন্তু একটি অপরূপ বৈষ্ণবীয় সংগীত শ্রবণে তার অসম্পূর্ণ, অপরিতৃপ্ত নিদ্রা ভেঙে যায়—

''রাই জাগো, রাই জাগো, শুক-শারী বলে,
কত নিদ্রা যাও লো কালো-মানিকের কোলে।''[৬৫]

কমললতার এই প্রেম সঙ্গীত যেন শুধু শ্রীকান্তের আঁখিপল্লবের নিদ্রা হরণকারী নয়, অন্তর চৈতন্য জাগ্রত করার ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য বলে গণ্য করা যায়। কমললতা তাকে আপন হৃদয়ে চিরদিনের মত সঙ্গী হিসেবে পেতে তাকে বারবার থেকে যাবার অনুরোধ করেন। কিন্তু শ্রীকান্ত সে অনুরোধকে উপেক্ষা করতে পারে না, বা তাকে স্বীকৃতিও দিতে পারে না, কেবলই আপন অন্তরের দোলাচলতায় নির্বাক হয়ে থাকেন। যে সাধনার সঙ্গী রূপে কমললতা শ্রীকান্তকে পেতে চান, সেই সাধনার ভার বহন করার আত্মবিশ্বাস শ্রীকান্তের মনে তখনো পুরোপুরি গড়ে ওঠেনি। এই আত্মনিবেদনের সমীকরণ নির্ণয়ে উপন্যাসে মুরারি ঠাকুরের একটি বৈষ্ণবীয় গীত, যা কমললতার কণ্ঠে গীত হয়ে পাঠককে উদ্বিগ্ন করে—

''সখি হে ফিরিয়া আপন ঘরে যাও, জীয়ন্তে মরিয়া যে আপনা খাইয়াছে তারে তুমি কি আর বুঝাও।।''[৬৬]

শ্রীকান্তের সঙ্গে বিরহবেদনার যন্ত্রণায় এই সংগীত তাই পরিস্থিতির বাস্তবতাকে সঠিক দিশা দেখিয়েছে। এই বিদায়ের লগ্নেই বৈষ্ণবী কমললতা চণ্ডীদাসকে স্মরণ করে—

১. ''কহে চণ্ডীদাস শুন বিনোদিনী সুখ দুখ দুটি ভাই
সুখের লাগিয়া যে করে পীরিতি দুখ যায় তার ঠাঁই।''[৬৭]

২. ''চণ্ডীদাস বাণী শুন বিনোদিনী পীরিতি না কহে কথা,
পীরিতি লাগিয়া পরাণ ছাড়িলে পীরিতি মিলায় তথা।''[৬৮]

শ্রীকান্তের এই সংগীত শ্রবণের স্পৃহা যেন কমললতার রাধা মনোভাবকে খুব সহজেই প্রতিপাদ্য করেছে। চণ্ডীদাসের বিনোদিনী যে শুধুমাত্র সুখের জন্যই শ্রীকৃষ্ণ আরাধনা করেছেন তা নয়, পিরিতির দুঃখময় সমুদ্রেও হাসি মুখে পতিত হয়েছে। এমনকি এই প্রীতিপূর্ণ ভালোবাসার

মধ্য দিয়ে প্রাণও চলে যায়, তবে তাও বিনোদিনীর ন্যায় কমললতা হাসিমুখে বরণ করতে প্রস্তুত। চণ্ডীদাসের রাধার সে আত্মত্যাগ, লোকচক্ষুকে উপেক্ষা করে তার যে কৃষ্ণের প্রতি সমর্পিত চিত্ত, সেই ভাবানুকূলতার স্রোতেই বৈষ্ণবী কমললতা অবগাহন করেছেন, শ্রীকান্তই যেন তার কাছে বাস্তবে রক্ত মাংসের ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ। আর এই উক্তির মধ্যদিয়েই শ্রীকান্ত ও কমললতার বিচ্ছেদবাণীর করুণা মূর্চ্ছনাকেই ঔপন্যাসিক প্রচ্ছন্ন আভাসে ইঙ্গিতায়িত করে গেলেন। কারণ বৈষ্ণব পদসাহিত্যে বিচ্ছেদেই যে প্রেমের সার্থকতা, তার মাধুর্য মিলন অপেক্ষা অধিক, সেই ভাবধারার বিচ্ছুরণ উভয় নরনারীর কথোপকথন থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। যে সমর্পণে, সহৃদয়তায়, আনন্দ, আরাধনায়, পুষ্প সুবাসে, সৌরভে, কীর্তন সংগীতে, পাখির কলকাকলিতে শ্রীকান্ত স্বীকৃতি দিয়ে গেলেন। মনে একরাশ দুঃখ নিয়ে শ্রীকান্ত কলকাতায় বাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

এভাবে প্রথম সাক্ষাতে কমললতা বৈষ্ণবী এক অজানা দমকা হাওয়ার পোলে ভর করে শ্রীকান্তের লাগামছাড়া জীবনে স্নেহের আবেষ্টনী দিতে চেয়েছিলেন। যে আক্ষেপানুরাগে, নিবেদনে সে শ্রীকান্তকে সেবা করেছে, তা বৈষ্ণবীয় দেব সেবার নামান্তর। নররূপী ঈশ্বর রূপে বৈষ্ণবীর জীবনে শ্রীকান্তের ক্ষণিক আগমনে চরিত্রটি পাঠকের কাছে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে নেয়।

বাড়ি ফেরার পর হঠাৎ রাজলক্ষ্মীর স্মৃতি শ্রীকান্তকে উন্মনা করে তোলে। বহুবছরের শোক স্তব্ধ স্মৃতি অতিক্রম করে তাদের পুনরায় সাক্ষাৎ হয়েছে। রাজলক্ষ্মীর মধ্যেও শ্রীকান্তের গৈরিক বসনা শ্রীরাধার মূর্তিকে মনে পড়েছে—

''আগে সে অনেক গহনা পরিত, মাঝখানে সমস্ত খুলিয়া ফেলিল— যেন সন্ন্যাসিনী। আজ আবার পরিয়াছে— গোটাকয়েক মাত্র—''[৬৯]

বহুদিনের কথোপকথনে তাদের আলোচনায় কমললতার প্রসঙ্গও উঠে আসে। রাজলক্ষ্মীর শ্রীকান্তের মনে কমললতার কি স্থান তা বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না। কমললতার স্মৃতিকে সজাগ রাখার জন্যই 'নতুন গোঁসাইজী' বলে ডাকার প্রস্তাব দেয় রাজলক্ষ্মী। শ্রীকান্তকে সে বলে—

''তবু হয়ত আচমকা কখনো কমললতা বলে ভুল হবে— তাতেও স্বস্তি পাবে।''[৭০]

এভাবেই বৈষ্ণবীয় 'প্রেমতত্ত্ব'-এর আন্তরিকতায় প্রিয় মানুষের সাধনা, তার স্মৃতিই যেন উপন্যাসকে নিগূঢ় জীবন বিশ্লেষণের আঙিনায় পদার্পণ করতে সহায়তা করে, যে অকুণ্ঠিত প্রেমকে কমললতা নির্দ্বিধায় উৎসর্গ করে দিতে পারে, সেই প্রেমকে কাছে পাবার জন্য রাজলক্ষ্মীর মন সর্বদাই শঙ্কিত থাকে। এই আমিত্ববোধ ও প্রেমের অধিকার অর্জনে তাই দুই নারীর প্রকাশভঙ্গিও ভিন্নপ্রকৃতির। সে কারণেই রাজলক্ষ্মী কমললতার স্মৃতিচারণার মধ্য দিয়ে শ্রীকান্তের মনকে যাচাই

করে নিতে চান। ফলে নারী অনাসক্ত শ্রীকান্তের প্রতি তার এক প্রকার ভীতির সঞ্চার হয়। আর এই উন্মাদনাই রাজলক্ষ্মীকে কমললতার আঁখড়া পর্যন্ত টেনে নিয়ে আসে। তাদের এই সাক্ষাতে শ্রীকান্তের বৈষ্ণবীয় জীবনের একটি সহজ-সরল প্রতিচ্ছবি বারবার তার মনকে আলোড়িত করে—

''এই নির্জন মাঠে যে-কয়টি প্রাণী শান্তিতে বাস করে তাহারা দীক্ষিত বৈষ্ণব-ধর্মাবলম্বী। ইহাদের জাতিভেদ নাই, পূর্বাশ্রমের কথা ইহারা কেহ মনেও করে না। তাই, অতিথি কেহ আসিলে ঠাকুরের প্রসাদ নিঃসঙ্কোচ শ্রদ্ধায় বিতরণ করে এবং প্রত্যাখান করিয়াও আজও কেহ ইহাদের অপমানিত করে নাই।''[৭১]

অর্থাৎ এক উদার নৈতিক জনদরদী, মানবী প্রীতির চেতনাই বৈষ্ণবীয় সহজিয়াদের জীবন সাধনার প্রধান অবলম্বন, এই সরল উদ্ধৃতি থেকে এই চিত্রই প্রতিভাত হয়। এদিকে রাজলক্ষ্মী ও নিজের অস্তিত্বের প্রমাণে প্রাচীন ও আধুনিক বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলীর সুর ধ্বনিতে শুদ্ধ তাল, লয়, ছন্দে, বিশুদ্ধতায়, উচ্চারণ স্পষ্টতায় এমন মধুর পরিবেশ সৃজন করলেন তাতে সকলেই মোহিত হয়ে গেলেন। সে গাইছিল—

''একে পদ-পঙ্কজ, পঙ্কে বিভূষিত, কন্টকে জরজর ভেল,
তুয়া দরশন-আশে কভু নাহি জানলুঁ চিরসুখ অব দূরে গেল।
তোহারি মুরলী যব শ্রবণে প্রবেশল ছোড়নু গৃহ-সুখ আশ,
পন্থক দুখ তুনহুঁ করি না গণনু, কহ তহিঁ গোবিন্দদাস।।''[৭২]

এ যেন অভিসারিকা রাধার বাণী, যে নিজের চরণ কমললতাকে পঙ্কে, কন্টকে জর্জরিত করে শুধু মাত্র কৃষ্ণ দর্শনে সকল দূরত্বকে অতিক্রম করে, তার বংশীধ্বনি শুনে গৃহসুখ পরিত্যাগ করে তার সান্নিধ্য পেতে চেয়েছেন। রাজলক্ষ্মীও যেন গোবিন্দদাসের পদের মধ্য দিয়েই তার প্রাণপ্রিয় মানুষটির জন্য আজ অভিসারিকা রাধার জীবন গ্রহণ করে জীবনের সকল সুখকে বিসর্জন দিয়েছেন। বড় গোসাইয়ের সঙ্গে কথোপকথনে, কৃষ্ণে সমর্পণের মধ্য দিয়েই নির্বাণ লাভের প্রসঙ্গ রাজলক্ষ্মীর হৃদয়লালিত বহুদিনের প্রেমকে পরিণতির একটি পথ দেখিয়ে দেয়। বড় গোঁসাই বললেন—

''সত্য প্রেমের কতটুকুই বা জানি আমরা? কেবল ছলনায় নিজেদের ভোলাই বৈ ত নয়! কিন্তু তুমি জানতে পেরেছ ভাই। তাই বলি, তুমি যেদিন এ প্রেম কৃষ্ণে অর্পণ করবে আনন্দময়ী ....''[৭৩]

গোঁসাই দ্বারিকা দাস যেন রাজলক্ষ্মীকে কৃষ্ণপ্রাণাগত রূপেই পরিশেষে প্রতিষ্ঠিত করতে

চেয়েছেন— এই 'কৃষ্ণতত্ত্ব'-এর আলোচনার মধ্য দিয়েই তাদের যাত্রার অন্তিম মুহূর্ত ঘনিয়ে এল, রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত আখড়া থেকে বিদায় নিয়ে কলকাতা অভিমুখে যাত্রা করলেন। তবে রাজলক্ষ্মীর মনে স্থানটির প্রতি একপ্রকার ভক্তিভাব চিরকালের মত স্থান করে নেয়। শ্রীকান্তের সঙ্গে সরল আলাপচারিতায় সে আখড়ার জীবনের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে, রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখে। সে সন্ন্যাসী জীবনকে কেন্দ্র করে এক স্বপ্নময় জগৎ তৈরি করে।

''আনন্দ ঠাকুরপো আনবে বই কিনে, আর আমি সাজিয়ে তুলব আমার মনের মত করে। ওর এক পাশে থাকবে আমার শোবার ঘর, অন্যপাশে হবে আমার ঠাকুরঘর।''[৭৪]

এভাবেই রাজলক্ষ্মীও ক্রমশ বৈষ্ণবীয় রসতাত্ত্বিক চর্চায় নিজেকে নিয়োজিত করেন— ''রাজলক্ষ্মী বৈষ্ণব-পদাবলী আরম্ভ করিল, শুনিয়া মনে হইল সেদিন মুরারিপুর আখড়াতেও বোধ করি এমনটি শুনি নাই।''[৭৫]

এরই মধ্যে রাধাকৃষ্ণ চরণাশ্রিতা কমললতার একটি পত্রে তিনি রাজলক্ষ্মীর কাছে শ্রীকান্তকে সকল সেবায়, স্নেহে, ভালোবাসার অনুগ্রহ জানিয়ে তাদের সম্পর্কের কল্যাণ কামনা করেছেন। নিরবিচ্ছিন্ন প্রেমের অপার করুণাধারা, হৃদয়ে যমুনার কুল ছাপিয়ে কমললতার এ প্রার্থনা প্রকৃত পক্ষে প্রাণের দেবতার পূজার উদ্দেশ্যেই সে নিবেদিত করেছে। পরিশেষে সুনন্দার উজ্জ্বল উপস্থিতি, গহরের মৃত্যু, তার সকল অর্থ কমললতাকে উৎসর্গ করা, গহরের সংসর্গে কমললতার ঠাকুর ঘরে যাবার নিষেধাজ্ঞা, শেষপর্যন্ত কমললতার আশ্রম ত্যাগ ও পরিশেষে তার সকল ধন পরিত্যাগ করে সে শেষবারের মতো শ্রীকান্তকে প্রণাম পরে চিরসাধনার যাত্রায় একাকী গমন করেন। শ্রীকান্তও এই অন্তিম সাক্ষাতের ক্ষণে তার প্রেমকে স্বীকৃতি দিয়ে বললেন—

''আজ বিশ্বাস করে আমাকে তুমি তাঁর পাদপদ্মে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হও— নির্ভয় হও। ... তোমাকে তাঁকেই দিলাম কমললতা, তিনিই তোমার ভার নিন। তোমার পথ, তোমার সাধনা নিরাপদ হোক— আমার ব'লে আর তোমাকে আমি অসম্মান করবো না।

হাত ছাড়িয়া দিলাম, ... শুধু মনে হইল হাত তুলিয়া সে যেন আমাকে শেষ নমস্কার জানাইল।''[৭৬]

এভাবেই বৈষ্ণবীয় ভাবমূর্তিতে নির্মিত কমললতা চরিত্রটি নিবেদিতপ্রাণ রাধারূপিণী হয়েই, শ্রীকান্তের চরণে আপন ঐশ্বরিক প্রেমকে আন্তরিকতায় উৎসর্গ করেই নির্বাণের পথে সমাহিত হয়েছে। রাজলক্ষ্মী ভক্তি, শ্রদ্ধা, চাতুর্যকে তাই কমললতা বহুক্ষেত্রে আপন হৃদয়ের সরলতায় অনেকাংশেই অতিক্রম করে গেছেন। নায়ক রূপে শ্রীকান্তের জ্যোতিও এই দুই নারীর কাছে

অনেকবেশি নিষ্প্রভ লেগেছে ঠিকই, চরিত্র বিশ্লেষণে ও কাহিনীপূর্ণতায় তিনটি চরিত্রই একে অপরের পরিপূরক রূপে উপন্যাসের গতিবেগকে সঠিক পথেই নিয়ন্ত্রিত করেছে। যার মূল চাবিকাঠি ছিল বৈষ্ণবীয় ভাব রসতত্ত্ব ও প্রেমতাত্ত্বিক আলেখ্য।

পরিশেষে একথাই প্রমাণিত হয় যে বৈষ্ণব পদসাহিত্য ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রকে বিভিন্ন ভাবে প্রভাবিত করেছে। সর্বপ্রথম উপন্যাস 'বড়দিদি'র মধ্যে তিনি বড়দিদি মাধবীর মধ্যে সর্বহারা মূর্তিমতী যোগিনী রাধার যে তপস্যারত রূপ, তার আত্মনিবেদন, সুরেনের সঙ্গে বৈধব্য জীবন পর্যায়ে সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা, ব্যর্থতা, সবকিছু এক বৈষ্ণবীয় পরিমণ্ডলে ব্যাপৃত হয়েছে, 'বিরাজ বৌ' উপন্যাসে বিরাজ মোহিনীর যে নারীর স্বাতন্ত্র্যের সংগ্রাম, সাংসারিক নৈপুণ্য স্বামীর প্রতি অবিচল নিষ্ঠা, স্বামীর অবিশ্বাসে আত্মঘাতী হতে গিয়ে বেঁচে যাওয়া, পরিসমাপ্তিতে স্বামীর সান্নিধ্যে তীর্থে যাবার পথে মৃত্যু, তাদের দাম্পত্য জীবনের নানা তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ প্রলয়ে বৈষ্ণবীয় আলেখ্য তাদের সম্পর্কের বিনির্মাণে স্পষ্ট উদ্ধৃত হয়েছে। কোথাও এসেছে সহজিয়া সাধন প্রণালীর ইতিবৃত্ত, বিশেষত বিরাজের স্বামী নীলাম্বরের জীবনচর্যায় সে সকল দিক আলোকিত হয়েছে। 'পণ্ডিত মশাই' উপন্যাসে সহজিয়া বৈষ্ণব রীতি প্রকৃতি, যেমন 'কণ্ঠীবদল', 'তিলকসেবা'-র মত বিষয়গুলি কুসুম ও বৃন্দাবনের দাম্পত্য স্মৃতির আঙিনায় উল্লিখিত হবার পাশাপাশি 'শ্রীরাধাতত্ত্ব'-এর বহু অংশ কুসুমের মধ্যে প্রতিবিম্বিত হতে দেখা যায়, এসেছে 'মান', 'কলহান্তরিতা' পর্যায়ের সূক্ষ্ম সাদৃশ্যের পটভূমি। 'শ্রীকান্ত-প্রথম পর্ব'-এর মধ্যে বৈষ্ণবীয় 'সখ্যরস', 'বাৎসল্যরস', 'মধুররসের ছায়াপাত হয়েছে কাহিনী ও চরিত্রের অন্তর্বয়ন নির্মাণে, 'শ্রীকান্ত-দ্বিতীয় পর্ব'-এ পিয়ারী ওরফে রাজলক্ষ্মী চরিত্রে শ্রীরাধার পূর্বরাগ থেকে মাথুর পর্যায়কে অসামান্য দক্ষতায় উপস্থাপন করা হয়েছে, টগর বৈষ্ণবী অভয়ার ব্যর্থ প্রণয়ে বৈষ্ণবীয় আত্মনিবেদন, মান পর্যায়কে ঔপন্যাসিক অসামান্য দক্ষতায় চিত্রিত করেছেন। 'নববিধান'-এ প্রদর্শিত হয়েছে বৈষ্ণব ধর্মের সূক্ষ্ম শাস্ত্রাচারের নির্মম পরিণতি, 'শ্রীকান্ত-তৃতীয় পর্ব'-এ রাজলক্ষ্মী ও সুনন্দার সম্পর্কে ব্যাক্ত হয়েছে বিশেষত শ্রীকান্ত বিরহে উভয়ের বার্তালাপে 'সখীতত্ত্ব'-এর ইঙ্গিত সহ চরম সাধ্যবস্তু 'প্রেম'-এর গভীরতর ভাবব্যঞ্জনা। 'শ্রীকান্ত-চতুর্থ পর্ব'-এর কমললতা বৈষ্ণবীর মধ্যে 'রাধাতত্ত্ব'-এর পূর্ণ বিকিরণে উপন্যাসের এই পর্বটি সর্বাধিক সমৃদ্ধ হয়েছে, লেখক কমললতা, শ্রীকান্ত, রাজলক্ষ্মীর ত্রিকোণ সম্পর্ককে বৈষ্ণব তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটে সর্বাধিক প্রত্যক্ষ যোগসূত্র দেখিয়ে 'স্বকীয়া-পরকীয়া তত্ত্ব'-এই নিরিখে উপস্থাপন করেছেন সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্মের অনাড়ম্বর, সহজ, সরল, মানব জীবনকে। লেখকের বাস্তব অভিজ্ঞতার অন্যতম সম্পদ 'শ্রীকান্ত'-এর প্রতিটি পর্বই যেন বৈষ্ণব তত্ত্ব-দর্শনের

'কৃষ্ণতত্ত্ব', 'রাধাতত্ত্ব', 'প্রেমবিলাস-বিবর্ততত্ত্ব', 'সখীতত্ত্ব', 'স্বকীয়া-পরকীয়া তত্ত্ব', 'সাধ্য- সাধন তত্ত্ব'কেই প্রত্যক্ষে কখনো পরোক্ষে রসভাষ্য করেছেন। এভাবেই কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের নির্বাচিত উপন্যাস সমূহ বৈষ্ণবতত্ত্ব-দর্শনের নানা আঙ্গিকে আলোকে মণ্ডিত হয়ে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে।

কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর বহুচর্চিত বৈষ্ণবতত্ত্ব-দর্শন প্রভাবাশ্রিত ছোটগল্প সমূহকে বিবিধ আঙ্গিকে উপস্থাপিত করেছেন। তিনি তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটে যেমন 'বাৎসল্যরস'কে গুরুত্ব দিয়েছেন, তেমনি বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসের মত বৈষ্ণব কবির ভাবাদর্শকে তাঁর কাহিনীর সূক্ষ্ম তন্ত্রীতে যুক্ত করেছেন। সনাতন বৈষ্ণব ধর্মে রাধাকৃষ্ণ কেন্দ্রিক মহিমাকে চরিত্রের অন্তবর্তী পরিকাঠামোয় যেভাবে সুশৃঙ্খলিত করে তাকে তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণে সমৃদ্ধ করেছেন, তার অন্বেষণই এই পর্বের মুখ্য বিশ্লেষ্য বিষয়।

মন্দির (১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দ):

'মন্দির' গল্পটি শরৎচন্দ্রের বহু আলোচিত ও বেনামে প্রকাশিত প্রথম গল্প। গল্পটি 'কুন্তলীন' পুরস্কার প্রাপ্ত হয় ১৯০৩ সালে। পরবর্তীকালে 'যমুনা' পত্রিকায় ১৩১৯ বঙ্গাব্দে স্থান লাভ করে। এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পুরোহিত সন্তান শক্তিনাথ কুম্ভকার পরিবারে আশ্রয় পেয়ে মৃত্তিকার পুতুল তৈরির পেশা গ্রহণ করে। এদিকে কায়স্থ জমিদার কন্যা অপর্ণা ধর্মপ্রাণা, সকল দিন তার অতিবাহিত হয় পূজা-অর্চনার মধ্য দিয়ে, এমনকি বিবাহ পরবর্তী জীবনেও মন্দিরে ঈশ্বর সেবায় আত্মনিবেদন হেতু সে স্বামীগৃহে পর্যন্ত যেতে অনিচ্ছুক। বৈরাগ্য ধূসর মনে স্বামী অমরনাথের শত প্রচেষ্টা, মান-অভিমানের পরেও অপর্ণা দাম্পত্য জীবনে প্রবল উদাসীন থাকে, শেষে অমরনাথের অকালমৃত্যুতে সে সকল লৌকিক মোহ থেকে নিজেকে মুক্ত করে ঈশ্বর সেবায় আত্মনিবেদন করেই জীবন সমুদ্রে অবগাহন করে। এরই মধ্যে আগমন হয়েছে শক্তিনাথের। শক্তিনাথ ও অপর্ণার সম্পর্কও শেষে মিলন পর্যন্ত এগোতে পারেনি, পারিপার্শ্বিক বাস্তবতার নিরিখে অপর্ণাকে মানবিক সম্পর্কের তুলনায় মন্দিরের নিষ্প্রাণ দেবতাই অধিক আকৃষ্ট করেছে। মনুষ্যত্বের থেকে দেবত্বই তার কাছে বড় মনে হয়েছে। স্বামী অমরনাথও সেই অতৃপ্ত হৃদয় নিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে, শক্তিনাথও সেই মন মন্দিরে প্রবেশের চাবিকাঠি কোনদিন হাতে পায়নি। অপর্ণার ব্যক্তিহৃদয়, বাহ্যিক জীবন সর্বক্ষেত্রেই প্রভু ভক্তির মাত্রাতিরিক্ত উচ্চতা তার হৃদয়ের সকল অনুভূতিকে এমন ভাবে আকড়ে ধরেছিল যে, সেখান থেকে উত্তরণের সকল পথ সে নিজেই স্তব্ধ করে দেয়। অমরনাথের মৃত্যুর শূন্যতায় শক্তিনাথ যে প্রেমের অর্ঘ্য নিয়ে অপর্ণার কাছে যায়,

অন্তিম লগ্নে তাকেও প্রবল জ্বরে প্রাণ হারাতে হয়। তার যাবতীয় প্রেমের সমর্পণ মদনমোহন দেববিগ্রহের কাছে। গল্পে স্পষ্ট বলা হয়েছে—

''এ গ্রামের জমিদার কায়স্থ। দেবদ্বিজে তাঁহার বাড়াবাড়ি ভক্তি। গৃহদেবতা নিকষনির্মিত মদনমোহন-বিগ্রহ; পার্শ্বে সুবর্ণ রঞ্জিত শ্রীরাধা-অত্যুচ্চ মন্দিরে রৌপ্য-সিংহাসনে তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত। বৃন্দাবন লীলার কত অপরূপ চিত্র মন্দির-গাত্রে সংলগ্ন। ... অপর্ণা বড় হইতে লাগিল। হিন্দুর মেয়ে— ঈশ্বরের ধারণা যেমন করিয়া হৃদয়ঙ্গম করে, সেও তাহাই করিতে লাগিল এবং পিতার নিতান্ত আদরের সামগ্রী এই মন্দিরটি যে তাহারাও বক্ষ-শোণিতের মতো একথা সে তাহার সমস্ত কর্ম ও খেলাধূলার মধ্যে প্রমাণ করিতে বসিল।''[৭৭]

অর্থাৎ জীবনের প্রথম কৈশোরের কাল থেকেই তার মধ্যে এক অনন্য কৃষ্ণভক্তি, শ্রীরাধার কুঞ্জ নির্মাণ ও বৃন্দাবন সুলভ অপরূপ কৃত্রিম আবহে সে নিজের চারপাশে বেষ্টন করে স্বপ্নচারিণী রূপে আত্মপ্রকাশ করে। তার পিতা এ বিষয়ে অত্যন্ত উদাসীন ছিলেন না, এমনকি মন্দিরের শঙ্খ ঘন্টা ধ্বনি তার হৃদয়ে আজন্ম পরিচিত নৈরাশ্যের হাহাকার, ক্রন্দনধ্বনি বহন করে নিয়ে আসে। এমনকি, বিবাহ পরবর্তী জীবনে স্বামী সম্ভাষণে বিন্দুমাত্র আবেগ না দেখিয়ে জপ-তপ করে কাটিয়ে দেবার কারণে ননদেরা তাকে 'গোঁসাই ঠাকুর' বলেও পরিহাস করত। স্বামীর মৃত্যুর পর মধু ভট্টাচার্যের ছেলে শক্তিনাথের মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ অবস্থায় বহুক্ষণ স্থির থাকার পর পুনরায় দেব মন্দিরে প্রবেশ করে প্রবল অন্তর্যন্ত্রণায় বলে —

''ঠাকুর আমি যা নিতে পাই নাই— তা তুমি দাও। নিজের হাতে আমি কখনও তোমার পূজা করি নাই, আজ করচি-তুমি গ্রহণ কর, তৃপ্ত হও, আমার অন্য কামনা নাই।''[৭৮]

এভাবেই অপর্ণার মত একজন সাধিকা নারী নিজ জীবন উৎসর্গ করে কৃষ্ণসেবাকেই ব্রতরূপে গ্রহণ করেছেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তার এই উৎসর্গীকৃত সেবাপরায়ণ মনোবৃত্তি তাকে যেন সর্বত্যাগীনি চণ্ডীদাসের রাধায় পরিণত করে। পাশাপাশি তার কৃষ্ণসেবার আর্তি মীরাবাঈ-এর সঙ্গে অনেকাংশেই সমধর্মী। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর প্রথম সৃষ্ট গল্পে নারীর যে আত্মসমর্পণের দিক নির্দেশিকা দিয়েছেন তা আগামীতে তার সাহিত্যে নারীর দৃঢ় অথচ আত্মোৎসর্গীকৃত রূপকে সবলে প্রতিষ্ঠিত করতে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে। প্রেমের মিলনই জীবনের চূড়ান্ত কাম্য নয়, বিরহের মাঝে মিলনের আনন্দকে বিশেষত ঈশ্বর সেবার পরিতৃপ্তিকেই বৈষ্ণবীয় ভাবরসে 'রাধাতত্ত্ব', 'প্রেমতত্ত্ব'-এর নিরিখে লেখক অপর্ণার মত নারীচরিত্রের মধ্য দিয়ে সার্থক ভাবেই তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন

রামের সুমতি (১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ):

রামের সুমতি গল্পটি ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে 'যমুনা' পত্রিকায় ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩১৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। গল্পটি শরৎচন্দ্রের প্রথম পর্বের সৃষ্টি। গল্পটিতে রামলাল নামক একটি ছেলের অতিরিক্ত দুরন্তপনা ও নারায়ণীর মত মহিলার স্নেহপ্রবণতার যে চিত্র, তা তাদের গোপন মাধুর্য মণ্ডিত একটি দৃষ্টি কোণ তৈরি করে বাৎসল্য রসের এক স্নেহমেদুর প্রতিচ্ছবি তৈরি করে। তবে গল্পটিতে রামের অতিরিক্ত দুরন্তপনা চরিত্রটির বাস্তব গ্রাহ্যতা অনেক ক্ষেত্রেই হরণ করেছে। রামলাল ও শ্যামলাল দুই বৈমাত্রেয় ভাই। রামলালের মাত্র আড়াই বছর বয়সে তার মাতৃবিয়োগ ঘটে এবং তখন থেকেই রামলালের প্রতি সকল দায়িত্ব কর্তব্য নারায়ণী অর্থাৎ শ্যামলালের স্ত্রী নিজ হাতে তুলে নেন। কিন্তু নারায়ণীর মাতা দিগম্বরী প্রবল ঈর্ষাকাতর হওয়ার কারণে সে সর্বদাই তাদের সম্পর্কের ছেদ ধরাতে বিশেষ আগ্রহী হয়ে নিজের মেয়ে, জামাইকে পনের বছরের রামলালের থেকে আলাদা করে দেয়। বাড়ির উঠোনের বেড়া রাম এবং নারায়ণীর সম্পর্ককে আরো গভীর থেকে গভীরতর করে, স্নেহবাৎসল্যের প্রবল আকর্ষণে তারা মিলিত হন। রাম ও শ্যাম নাম দুটির যে ঐশ্বরিক ব্যাপ্তি এর মধ্য থেকে প্রভু শ্রীকৃষ্ণের অস্তিত্বকে আমরা অনুধাবন করতে পেরেছি, স্নেহ বাৎসল্যের পাশাপাশি কাহিনীতে এসেছে যশোদারূপী নারায়ণী ও গোপাল রূপী রামলালের অসীম মায়াময় বন্ধন। যে বন্ধন সকল মোহপাশকে ছিন্ন করে নিঃস্বার্থ মাতাপুত্রের কোমল স্নেহমধুর সমীকরণকে ব্যক্ত করেছে। তাইতো গল্পের শেষে নারায়ণী মাতা দিগম্বরীকে রামের সুমতি ফিরে আসায় তার প্রতি অপার মাতৃস্নেহে জানিয়েছেন—

''তোমাকে ভাবতে হবে না মা; এখন একটু সামনে থেকে যাও, দুটো খাইয়ে দিই। ও আমার তিনদিন অনাহারে আছে। বলিতে বলিতে তাহার চোখের জল আবার ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। ... নারায়ণী আরো একবার তাহার মুখ তুলিয়া ধরিয়া ললাটে ওষ্ঠাধর স্পর্শ করিয়া চোখের জলের ভিতর দিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, তুই এখন ভাত খা।''[৭৯]

অর্থাৎ এই উক্তি থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় নারায়ণীর মাতৃহৃদয়জাত সন্তান বাৎসল্য রামের সুমতি ফিরিয়ে আনে এবং স্নেহকাতর অশ্রুজলে তার মুখে অন্ন তুলে দিয়ে বাৎসল্য প্রেমের এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। ভারতীয় আদর্শের চরিত্র কাঠামোয় নির্মিত রাম চরিত্রে তার মাতৃতুল্য বৌদির মাত্রাতিরিক্ত স্নেহাধিক্য তাদের বিচ্ছেদের কারণ হয় ঠিকই কিন্তু রাম তার সকল ত্রুটি শুধরে নেবার প্রতিশ্রুতি জানিয়ে, সামাজিক রীতির আদর্শে নিজেকে সুশৃঙ্খল করায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। এমনকি পরিশেষে উভয়ের মিলনে অভূতপূর্ণ দৃশ্য সংযোজন করে শরৎচন্দ্র যশোদা ও

গোপালের মিলন চিত্রের রূপকেই প্রস্ফুটিত করতে সফল হয়েছেন। এবার আশা যাক শরৎচন্দ্রের 'বিন্দুর ছেলে' ছোটগল্প প্রসঙ্গে।

বিন্দুরছেলে (১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ):

বাংলা কথাসাহিত্যের সুবিস্তৃত আঙিনায় শরৎচন্দ্রের কৃতিত্ব সর্বাগ্রে অবস্থিত। তিনি উপন্যাস ও ছোটগল্পে বাঙালি জীবনের সরল জীবন কথা ও দ্বান্দ্বিকতার মেলবন্ধন ঘটিয়েছে, কথাসাহিত্যিক প্রাচীন জীবনপন্থার সঙ্গে নব্য নাগরিক জীবনের অস্থিরতাকে সমান পারদর্শিতায় তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর বহু ছোটগল্পের আঙ্গিক বড় গল্পের আকারে উপস্থাপিত হলেও অন্তর্নিহিত ব্যঞ্জনায় উপন্যাসের তাৎপর্য না হলেও সুচারু লেখনীর স্পর্শে তা পাঠককে তার সমগোত্রীয় ভাবনায় ভাবিত করেছে। একদিকে সাহিত্যের শিল্পশৈকর্য ও অন্যদিকে প্রাচীন সনাতনী ধর্মের সঙ্গে উনিশ শতকীয় কাহিনীর সংযোগ সাধনে তিনি বহু ছোটগল্পে ভূয়সী পারদর্শিতা দেখিয়েছিলেন। আলোচ্য 'বিন্দুর ছেলে' গল্পটি তার মধ্যে অন্যতম। গল্পটি 'যমুনা' পত্রিকায় শ্রাবণ ১৩২০ বঙ্গাব্দে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়।

'রামের সুমতি' গল্পেরই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে 'বিন্দুর ছেলে' গল্পের ভাব পরিকল্পনায়, অমূল্যধনকে বিন্দুবাসিনী পুত্রবৎ স্নেহে তার হৃদয়ে আশ্রয় দেন। আভিজাত্যে, স্নেহে, মমতায় সে সর্বদাই অমূল্যকে প্রবল স্বাধীনতা দিয়েছেন এবং সকল বিপদ থেকে আগলে রেখেছেন কিন্তু এই অন্ধ স্নেহ বিন্দুবাসিনী ও তার জা অন্নপূর্ণার মধ্যে সম্পর্কের বিভাজন রেখাকে স্পষ্ট করে, স্নেহের প্রবল আবেগে বিন্দু ধীরে ধীরে মৃত্যুর পথে তলিয়ে যেতে শুরু করলে অমূল্যর স্নেহকে অন্নপূর্ণা মান্যতা দেন। ফলে অমূল্য ও বিন্দুর মিলন হয়। এ যেন বাৎসল্যের আরও এক প্রতিচ্ছবি শরৎচন্দ্র নির্মাণ করলেন তাঁর বহু আলোচিত 'বিন্দুর ছেলে' ছোটগল্পে।

বৈষ্ণবীয় পঞ্চরসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রস বাৎসল্য প্রেম। ড. সুখেন্দুসুন্দর গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের ভূমিকা' গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন— অনুকম্পাপ্রাপ্ত ব্যক্তির উপর অনুকম্পাকারী যে সম্ভ্রম শূন্য রতি তাকেই বলে 'বাৎসল্য' বা 'বৎসল'। বাৎসল্য ভক্তিতে বালগোপাল শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন, মাতা যশোদা আশ্রয় অবলম্বন এবং শ্রীকৃষ্ণের শৈশব সুলভ চপলতা ইত্যাদি হল উদ্দীপনা। তাইতো যাদব ও মাধব সহোদরা ভাই না হলেও তাদের আন্তরিক সম্পর্কের ফসল রূপে বড়ভাই যাদবের পুত্র অমূল্যর প্রতি ছোটভাই মাধবের নিঃসন্তান স্ত্রী বিন্দুর যে সন্তানসম প্রীতি তার সুবিস্তৃত ও সুগভীর প্রভাব পারিবারিক অশান্তির কালবৈশাখী ঝড়েও ভূপতিত হয়নি। তাইতো পরিশেষে উভয়ের মিলনে বৈষ্ণবীয় বাৎসল্যরসের মধুর স্রোতধারার

সঙ্গে হৃদয় প্রশান্তির রূপ সংমিশ্রণে শরৎচন্দ্র অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, একথা বলা বড়ই যুক্তিসঙ্গত। পারিবারিক জীবনের স্নেহ, প্রীতি, মান-অভিমান, পরমসহিষ্ণতা, দোষ-ত্রুটির মধ্য দিয়ে অমূল্য ও বিন্দুর সম্পর্ক হয়ে উঠেছে মাতা ও পুত্রের। তাইতো মস্তক মুণ্ডিত অমূল্যকে দেখে তার বালক কৃষ্ণের কথা মনে পড়ে তাকে মথুরার কৃষ্ণচন্দ্র রাজা বলেও সম্বোধিত করেছেন।

পথনির্দেশ (১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ):

শরৎচন্দ্রের বহুচর্চিত গল্পের অন্যতম হল 'পথনির্দেশ' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'যমুনা' পত্রিকায় বৈশাখ ১৩২০ বঙ্গাব্দে। গল্পটি প্রেমের অভিনব বর্ণনা ও বিন্যাস গুণে এক মোহময় আবেষ্টনীর মধ্যে পাঠক সমাজকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছিল। নায়ক ব্রাহ্ম ও নায়িকা হিন্দু হওয়ায় সামাজিক বৈষম্য, অন্তর্দ্বন্দ্ব, ঘাত-প্রতিঘাত প্রভৃতি কারণে তারা মিলিত হতে পারেনি। এই বিচ্ছেদ যন্ত্রণার সঙ্গে মানবী বন্ধনের আবেগকে শরৎচন্দ্র বৈষ্ণবীয় অনুষঙ্গ অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণের প্রণয় ব্যাপ্তির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি যুক্ত করেছেন। প্রাচীন সংস্কারের মোহজাল ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করার দুঃসাহসিক শক্তি তাদের প্রেমে অনুপস্থিত থাকায় তারা ব্যর্থ প্রণয়ীর মত বিরহে কাতর হলেন। কাহিনীতে মধ্যবিত্ত গৃহস্থ কর্তা পতিত পাবন যখন যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়ে মারা যান তখন তার স্ত্রী সুলোচনা ও কন্যা হেমনলিনীর পরিবার প্রায় অর্ধমৃত। প্রবল, আর্থিক অনটনে তারা মা ও মেয়ে উভয়েই পর্যুদস্ত। এদিকে আর্মহাস্ট স্ট্রীটের প্রকাণ্ড বাড়ির অদৃশ্য শূন্যতায় থাকেন গুণেন্দ্র, এই পরিস্থিতিতে উভয়ের সাক্ষাত ঘটে এবং ধর্মীয় সংস্কারের একটি বিশেষ মনোভাব কিভাবে তাদের প্রেমের পথে বাধা সৃষ্টি করে তা উদ্ধৃত করেছি—

''হেম কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, ... মা বলছিলেন, শান্তিপুরে না কোথায় সমস্ত ঠিক হয়ে গেছে! ... গুণেন্দ্র এবার বুঝিতে পারিয়া হাসিয়া বলিল, ... বিয়ে না দিলে তোমাদের জাত যায় কি? ... আমাদের যায় না— আমরা ব্রাহ্ম। কিন্তু তোমাদের যখন সময়ে না বিয়ে দিলে জাত যায়, তখন দিতেই হবে। হেম চোখ মুছিয়া বলিল, তোমরাই ঠিক। তোমরাই মানুষ, তাই মানুষকে এমন ধরে- বেঁধে বধ কর না।''[৮০]

অর্থাৎ এই উক্তি প্রত্যুক্তিই হিন্দু ধর্মের সঙ্গে ব্রাহ্ম ধর্মের সংঘাতকে বাস্তবায়িত করে নারী পুরুষের প্রেমের মিলনে বাধা সৃষ্টি করেছে। হেমনলিনী গুণীর প্রত্যাখ্যানে অন্তরকে কিছুতেই ক্ষান্ত করতে পারে না। বিরহিণী রাধার ন্যায় তার প্রেমবহ্নির পরিচয় সে সর্বসমক্ষে দিতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করে না—

''হেম উচ্ছিষ্টাবশেষ হইতে একগ্রাস মুখে পুরিয়া দিয়া বলিল, ঠাকুর ভাত দাও। গুণীদার

এঁটো পাতে বসে খাবার যোগ্যতা সংসারের ক'জনের ভাগ্যে আছে? এ পাতে খেতে পাওয়া ভাগ্য।"[৮১]

যে হিন্দুধর্মীয় ত্যাগের আদর্শে হেমনলিনী গুণীর প্রেমকে সমাজ স্বীকৃতি দেয়নি, সেই ধর্মের প্রতি হেমনলিনীর মায়ের মৃত্যুর পর থেকে আচার-ব্যবহারে আশ্চর্য পরিবর্তন দেখা দেয়। গুণেন্দ্রর সহিষ্ণুতা, নিস্তব্ধতাতেই সে তার প্রেমকে অনুভব করে গীতা উপনিষদের অনুবাদে কালাতিপাত করে, বৈষ্ণব জীবনে সধবার সকল চিহ্নই তার শরীরে থাকলে বৈধব্যের সকল কঠোরতা সে নিষ্ঠা সহ পালন করে। সকল বাহুল্য থেকে মুক্ত হয়ে এক বেলা রান্না করে খেত। গৃহকর্মের সময় ছাড়া সকল সময় ধর্মচর্চায় অতিবাহিত করত। গুণীর কাছে সে সমর্পিতচিত্ত থাকলেও গুণী তাকে ধর্মভয়ে বৈধব্য জীবনের পরেও হেমনলিনীকে স্বীকৃতি দিতে অসমর্থ থেকেছেন। অথচ দিনদিন গুণীর চোখের সামনেই সে যৌবনে পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে থাকে। তার এই সংযমী স্থিরতাই তাকে মনের মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন রাখে। কিন্তু গল্পের শেষে সে গুণীর সিন্দুক খোলে এবং ধরাও পড়ে। গুণীও শেষে হেমকে কাশী যাবার প্রস্তাব দেন। এমনকি সে অনুভব করে যে প্রেমকে সে অবজ্ঞায় গ্রহণ করেনি আজ তা সে প্রাণপণ পেতে চায়—

''অতৃপ্ত বাসনাই মহৎপ্রেমের প্রাণ, এর দ্বারাই সে অমরত্ব লাভ করে যুগে যুগে কত কাব্য, কত মধু, কত অমূল্য অশ্রু সঞ্চিত করে রেখে যায়, তখন নিঃসংশয়ে উপলব্ধি হবে, কেন রাধার শতবর্ষ ব্যাপী বিরহ বৈষ্ণবের প্রাণ, কেন সে প্রেম মিলনের অভাবেই সুসম্পূর্ণ, ব্যথাতেই মধুর।"[৮২]

এভাবেই গুণী হেমনলিনীকে নিয়ে কাশী যাত্রার পথে মিলিত হতে চেয়েছেন। ভগবানের আশীর্বাদেই অক্ষয় হবে তাদের সকল সুখ শান্তির পদযাত্রা। শরৎচন্দ্র সমগ্র গল্পে এভাবে হেমকে বিরহিণী রাধার অন্তর্যন্ত্রণার অধিকারী করে, তার সেই অপ্রাপ্তির মধ্যেও প্রাপ্তির আনন্দকে পূর্ণতা দিয়েছেন। এভাবেই বৈষ্ণবীয় প্রেমতত্ত্বের অভিনব রসসংযোগে কাহিনীতে সঞ্চারিত হয়েছে নবপ্রাণবানী। নামকরণে 'পথনির্দেশ' শব্দটিও যেন জীবনের অন্তিম লক্ষ্যকে এভাবে সুনিশ্চিৎ করেছে। যে কিনা নিঃশব্দ বেদনার, অশ্রুবিগলিত নয়নে বহুদিন আগেই সে ত্যাগের পথে যাত্রা করেছে। আজ এই মাহেন্দ্রক্ষণে যেন গুণীর উক্তিই সেই যাত্রাপথে পুষ্প সুরভিত মসৃণতা প্রদান করতে পেরেছে।

মেজদিদি (১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দ):

গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায়, কার্তিক ১৩২১ বঙ্গাব্দে। 'রামের সুমতি' ও 'বিন্দুর ছেলে'-র ন্যায় পারিবারিক পরিকাঠামো ও সম্পর্কের অভূতপূর্ব টানাপোড়েনের আবহে

রচিত হয়েছে 'মেজদিদি' নামক আরো এক স্নেহ মেদুর গল্প। সেখানে বড়বধূর ভ্রাতা পিতৃ-মাতৃহীন কেষ্টর প্রতি মেজবধূ হেমাঙ্গিনীর সহানুভূতি, সহমর্মিতা ও ভালোবাসার যে চিত্রপট তা এক নিঃস্বার্থ স্নেহের পরিমণ্ডল রচনা করে। সে তার নিজের ভ্রাতা না হয়েও পরম স্নেহে তার জায়ের বৈমাত্রেয় ভাইকে পরম মমতায় কাছে টেনে নিতে দ্বিধাবোধ করেননি। এদিকে আপন ভাইকে দিয়ে কেষ্টর দিদি কাদম্বিনী সংসারিক সকল কার্যে দাসত্ব করাতে বিন্দুমাত্র সংকোচবোধ করে না। কেষ্ট যেন প্রকৃত অর্থেই তাদের পরিবারের কলহ এই বোধেই সে বারবার কেষ্টকে আঘাত দিতে পিছপা হয় না। কিন্তু হেমাঙ্গিনী তার প্রতিবাদ করে অসহায় কেষ্টকে আপন পুত্রসম স্নেহে বুকে টেনে নেয়। ফলে শুরু হয় কাদম্বিনী ও হেমাঙ্গিনীর মধ্যে পারস্পরিক সাংসারিক কলহ। এমনকি স্বামী বিপিনের সাময়িক বাধা কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত হৃদয় উজাড় করা স্নেহে পুত্ররূপে, ভ্রাতৃরূপে হেমাঙ্গিনী কেষ্টকে চিরদিনের মত নিজের কাছে ফিরে পায়। সকল অস্বাভাবিকতা ও অশান্তিকে অতিক্রম করে হেমাঙ্গিনী সংসারে চিরশান্তির পরিবেশ রচনা করতে পেরেছেন। এমনকি গল্পের শেষে বিপিন অর্থাৎ হেমাঙ্গিনীর স্বামীও তাদের এই সম্পর্ককে স্বীকৃতি দিয়েছেন। সেও বলেছে—

''কেষ্ট, তোর মেজদিকে তুই বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে আয় ভাই; শপথ করচি, আমি বেঁচে থাকতে তোদের দুই ভাই-বোনকে আজ থেকে কেউ পৃথক করতে পারবে না। আয় ভাই, তোর মেজদিকে নিয়ে আয়।''[৮৩]

বৈষ্ণবীয় রসতত্ত্বেরই আরো একদিক উদ্ঘাটিত করছেন শরৎচন্দ্র। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মাতা যশোদা বা পিতা নন্দের যে সম্পর্ক ভগবানের প্রতিও ভক্তের সেই মধুর সম্পর্কই বিদ্যমান। এই স্থায়ীভাবের অপর নামই বৎসলতা, এই রসে পরিচর্চা, শ্রদ্ধা অন্তর্লীন থাকে। তবে মমতার স্থান এখানে অধিক, এই 'বাৎসলতা রতি' পণ্ডিতদের মতে 'বৎসল ভক্তিরস' নামে অভিহিত হয়ে থাকে। ঠিক সেই রূপ, পরিবেশ রচিত হয়েছে ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের 'মেজদিদি' গল্পে। অভিমানে মেজদিদি তাই কেষ্টকে দূরে সরিয়ে দিলেও তার অন্তরে বেজেছে মাত্রাহীন বেদনা কারণ বাৎসল্যের সঙ্গেই যুক্ত থাকে শান্ত, দাস্য, সখ্যের সকল গুন বা সম্ভ্রমশূন্যতা। বাৎসল্যের স্নেহপ্রীতি, মমতা তাড়িত ভর্ৎসনার সকল অধিকার বোধের গুণে আলোচ্য গল্পটিতে কেষ্ট যেমন মেজদিদির আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছিল। ঠিক সেভাবেই হেমাঙ্গিনী হয়েছিল তার যশোদারূপী মাতা। শরৎচন্দ্র বৈষ্ণবীয় রসতাত্ত্বিক ভাবনায় গল্পকে নিয়ে গেছেন এক অভিনব উচ্চাঙ্গ মার্গে।

আঁধারে আলো (১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দ):

প্রেম-মনস্তত্ত্বের আরো এক নিপুণ উপস্থাপনা শরৎচন্দ্রের 'আঁধারে আলো' গল্পটি। শরৎচন্দ্র

তাঁর সাহিত্যে কাহিনী ও চরিত্রকে যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভ্যন্তর থেকে গ্রহণ করেছেন তার অনন্য প্রমাণ 'আঁধারে আলো' গল্পটি। গল্পটি 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় ১৩২১ বঙ্গাব্দে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। রিয়ালিজমের সঙ্গে রোমান্টিসিজমের এক অনবদ্য সংমিশ্রণ আমরা তাঁর রচনা থেকে স্পষ্ট আলোকিত হতে দেখি। পরিমিত শিল্পবোধের মেলবন্ধনেই তিনি জীবন সাধনার মূল্যবান চাবিকাঠিটি তাঁর সাহিত্যে যথাযথই তুলে ধরতে পেরেছিলেন। আধুনিক উচ্চশিক্ষিত ছেলে সত্যেন্দ্র চৌধুরী। সদ্য বিয়ে পাশ করে, এম.এ পাস করার প্রবল ইচ্ছায় কলকাতার পঠরত। বিবাহের বিষয়ে উদাসীন, সংসারের ঔদাসিন্যে নিজেকে অহেতুক জড়িত করে আত্মসম্ভ্রম নষ্ট করতে নারাজ। এক পূর্ণিমার দিন গঙ্গার ঘাটে বছর আঠার-উনিশের এক নারীকে দেখে সে খানিক অভিভূত হয়। তার রূপের বর্ণনায়—

''পরনে সাদাসিধা কালোপেড়ে ধুতি, দেহে সম্পূর্ণ অলঙ্কার বর্জিত, হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া কপালে চন্দনের ছাপ লইতেছে, এবং তাহারই পরিচিত পাণ্ডা এক মনে সুন্দরীর কপালে নাকে আঁক কাটিয়া দিতেছে।''[৮৪]

অর্থাৎ প্রথম দর্শনেই নারীটির বাহ্যিক বর্ণনায় বৈষ্ণবীয় সাধিকার চিত্রকে ইঙ্গিতে প্রতিকায়িত করেছেন লেখক। এভাবে জাহ্নবী তীরে সত্যেন্দ্রর সঙ্গে সাতদিন তাদের চার চক্ষুর মিলন ঘটে বিনা সম্ভাষণেই। এরপর ধীরে ধীরে তাদের প্রণয় সাক্ষাত কাহিনীকে বৈষ্ণবীয় পরিমণ্ডলের দিকে অগ্রসর করে। কিন্তু একদিন অপরিচিতা রমণীর গৃহে সহসা আগমনে তার ঘরের হারমোনিয়াম, তবলা, মদ্য, অলংকারে বিভূষিতা দেহে একরাশ ঘুঙুর পায়ে দেখে সত্যেন্দ্র স্মম্ভিত হয়ে যান। রমণী তার পরিচয় দেন শ্রীমতী বিজলী নামে। সত্যেন্দ্রকে সে উদ্দেশ্য করে বিদ্যাপতির পদের অবতারণা করে এর সকল মানোবাঞ্ছাকে সে সর্বসমক্ষে প্রকাশিত করে দেয়—

''আজু রজনী হাম, ভাগে পোহায়নু
পেখনু পিয়া মুখ-চন্দা
জীবন যৌবন সফল করি মাননু
দশ-দিশ ভেল নিরদন্দা।
আজু মঝু গেহ গেহ করি মাননু
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে, অনুকূল হোয়ল
টুটল সবহু সন্দেহা।

পাঁচবাণ অব লাখবাণ হউ

মলয় পবন বহু মন্দা।

অব সো ন যবহু মরি পরিহোয়ত—

তবহুঁ মানব নিজ দেহা—”[৮৫]

বিজলীর কণ্ঠে গীত সতেন্দ্রনাথের প্রতি তার প্রেমকে বৈষ্ণবীয় ধ্যান ধারণার সহযোগে উপস্থাপিত করে আপন অন্তরের কথাকেই বহিঃপ্রকাশ করতে চেয়েছেন। বিদ্যাপতির ব্রজবুলি ভাষায় মূল পদটিতে দু-একটি শব্দের পরিবর্তন করে প্রায় অধিকাংশ শব্দই অক্ষত রেখে বোঝাতে চেয়েছেন— রাধারাণীর মনে প্রেমের প্রবল আকুলতায় সকল দেহ মনে দ্বন্দ্বের অবসান হয়েছে, এখন সকল সংসারে কেবলই আনন্দ। বহুভাগ্যে শ্রীমতির নিশি রাত অবসান হয়েছে তার প্রিয়তমের চন্দ্র বদন দেখে। শ্রীমতীর জীবন যৌবন সফল বলে সে মানলেন, তার দশদিক আজ নির্দ্বন্দ্ব হল। শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আজ তার গৃহকে প্রকৃত আলয় বলে অনুভূত হল। দেহকে দেহরূপ জ্ঞান হল। আজ সৌভাগ্যে তার উপর সহায় হলেন দেখেই, তার মনের সকল সন্দেহ দূরীভূত হল। যে কোকিলের কুহুতান এক পর্যায় তার জীবনকে উৎপীড়িত করেছে, আর সেই কলকাকলিতেই তিনি মুগ্ধ। আজ লক্ষ চন্দ্রের মাধুরিময় কন্দর্পের পঞ্চবাণে, মৃদুমন্দ মলয় পবন প্রবাহিত হোক। এই সকল বিষয়েই তিনি প্রেমিক প্রভু শ্রীকৃষ্ণকে অনুভব করে, তাকে দেখে তার নিজ দেহকে সার্থক মনে হয়েছে। শ্রীমতির এই কৃষ্ণপ্রাপ্তিতে সকল বাহ্যিক মর্মজ্বালা থেকে সে আজ প্রেমালোকে বিচরণ করে নিজেকে সৌভাগ্যবতী রূপে চিহ্নিত করেছেন। শ্রীরাধার প্রাপ্ত এই নবপ্রেম তার ভাবোল্লাসের পদসমুহের স্মরণ করায়।

এভাবেই বৈষ্ণবীয় প্রেমতত্ত্বের আলোকে বিজলী ব্যক্তিগত অত্মোপলব্ধির এক অভাবনীয় আনন্দলোকে অতি নিবিড় ভাবে সত্যেন্দ্রকে তার সম্মুখে অনুভব করেছেন। তার এই নর্তকী জীবনের দীর্ঘ অন্ধকারাচ্ছন্ন পথে সত্যেন্দ্রর মত পুরুষের আগমন শ্রীকৃষ্ণের পরম-স্বরূপ আনন্দের প্রতিরূপ। সে জানে সত্যেন্দ্রকে সে কোন দিনই পাবে না, তবু আজ এই পসরার রাতে এভাবে তার আকস্মিক আগমনে সে সকল লোকলজ্জার ভয় থেকে মুক্ত হয়ে ব্যক্তিগত ভাবোল্লাসের স্রোতে বিদ্যাপতির পদের উচ্চারণে নিজ অন্তরকে স্বান্তনা দিয়েছেন। এখানেই পদের প্রসঙ্গটিও গল্পে সঞ্চারিত করেছে অভিনব প্রেমরস। এরপর সত্যেন্দ্রের রাধারাণীর সঙ্গে বিবাহ, তাদের সন্তান জন্ম, অন্নপ্রাশনে সেই বিজলীর নৃত্যদল সহ আগমন, ঘটনাগুলি রাধারাণীর মানবিক চক্ষু উন্মীলিত করে, সতেন্দ্র যে প্রেমকে সামাজিক সংস্কারের স্বীকৃতি দেয়নি। সেই প্রেমকে রাধারানী

স্বীকৃতি দিয়েছে এভাবে—

''দিদি, সমুদ্র-মন্থন করে বিষটুকু তার নিজে খেয়ে সমস্ত অমৃতটুকু এই ছোটবোনটিকে দিয়েচ। তোমাকে ভালোবেসেছিলেন বলেই আমি তাঁকে পেয়েচি।''[৮৬]

পরিশেষে রাধারাণীর সুখী দাম্পত্য জীবনের কামনায় বিজলী বিরহযন্ত্রনার অগাধ সমুদ্রে একাকী পাড়ি দেয়। নারীর এই অকপট ত্যাগেই শরৎচন্দ্রের নায়িকারা বিশেষ স্বতন্ত্রতার দাবি রাখেন। বিদ্যাপতির পদটিই যেন গদ্যের মূল গতিপথের চাবিকাঠিটি নিয়ন্ত্রণ করেছে। একটি নারীর জীবনে চিরঅন্ধকারময় জীবনে আকস্মাৎ ক্ষণিক সুখের আগমন হয়ে পুনরায় অন্ধকারে মিলিয়ে যাওয়াতেই গল্পের নামকরণকে বিশ্বস্ত করেছে।

স্বামী (১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দ) :

'স্বামী' গল্পটি পারিবারিক আলেখ্যে নির্মাণ করেন লেখক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। একটি অপরিণত নারীর জীবনে নানা উত্থান পতনকে লেখক উক্ত বড় গল্পে রসসমৃদ্ধ আকারে উপস্থাপিত করেছেন। সৌদামিনী এ কাহিনীর নায়িকার আসনে অধিষ্ঠিত, তাকে কেন্দ্র করেই গল্পের গতিময়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। পিতৃহারা এই বালিকাকে পরম স্নেহে লালিত-পালিত করেন তার নিঃসন্তান মাতুল। সৌদামিনীর মাতুলালয়ের পার্শ্ববর্তী জমিদার বিপিন মজুমদারের বংশধর নরেনের সঙ্গে তাঁর বিশেষ সখ্যতা গড়ে ওঠে। কিন্তু সৌদামিনীর চিতোর গ্রামের এক যুবকের সঙ্গে বিবাহ হলে, সে তার প্রতি উদাসিন থাকেন তথা তাকে স্বামীর মর্যাদা দিতে অসমর্থ হন, এমনকি তার স্বামীকে তিনি মন থেকে মেনে নিতে পারেন না। কিন্তু সৌদামিনীর স্বামী ঘনশ্যাম তার পত্নীর প্রতি কখনোই অবহেলা করেননি, স্বামীর এই হৃদ্যতায় সে মুগ্ধ হলেও তার কাছে এ স্নেহপ্রাপ্তি অসহনীয় বেদনা সৃষ্টি করে। এই ঘনশ্যাম হলেন এক নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব। সে তার স্ত্রীকে বলেছেন—

''আমি বোষ্টম, আমার ত নিজের উপর অত্যাচার রাগ করতে নেই। মহাপ্রভু আমাদের গাছের মত সহিষ্ণু হতে বলেছেন, আর তোমাকে এখন থেকে তাই হতে হবে। ... বৈষ্ণবের স্ত্রী এই মাত্র তোমার অপরাধ।''[৮৭]

সৌদামিনীর নাস্তিক্যবোধ, স্বামীর প্রতি উদাসীনতা সত্ত্বেও ঘনশ্যাম স্ত্রীর প্রতি কর্তব্যে কখনোই বিমুখ হননি। চৈতন্যোত্তর 'গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম'-এ বর্ণিত শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমধর্মের তত্ত্ব ব্যাখা উদ্ধৃতির মধ্য দিয়ে উপস্থাপিত করে। বৈষ্ণবধর্ম ও জীবনাচরণের এক নিগূঢ় দিককে লেখক ঘনশ্যামের উক্তির মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন। জীবের সকল সদ্‌গুণের আয়ত্তীকরণের বাণী বৈষ্ণবীয় তত্ত্বালেখ্য উক্ত উদ্ধৃতিতে প্রতিপাদিত হয়েছে। তাই স্বামীর এই ঔদার্যে মোহিত

হতে হতে সৌদামিনীর চিত্তে একপর্বে স্বামীর প্রতি মমত্ববোধ জাগ্রত হয়। বিবাহ পরবর্তী জীবনে সৌদামিনীর সঙ্গে নরেনের গোপন আলাপচারিতা, তার শাশুড়ির নিকট সব কিছু প্রকাশিত হওয়ার মত ঘটনাগুলি সৌদামিনীকে বিধ্বস্ত করে। এরপর নরেন তাকে নিয়ে গৃহত্যাগী হলে সৌদামিনীর হৃদয়ে স্বামীর প্রতি অমোঘ আকর্ষণ ঘনীভূত হয়, সে স্বামীর কাছে প্রত্যাবর্তন করতে চায়, কিন্তু নরেনের নিষ্ঠুরতায় তাকে গৃহবন্দী থাকতে হয়। অবশেষে একদিন তার স্বামী ঘনশ্যাম তার স্ত্রী সৌদামিনীকে উদ্ধার করে স্ত্রীর পূর্ব মর্যাদা স্থান পরম সম্মানে তাকে ফিরিয়ে দিয়ে বৈষ্ণবীয় 'প্রেমতত্ত্ব'-এর অপরূপ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। তারপর মূল বৈষ্ণবীয় অনুষঙ্গ সৌদামিনীর স্বামী ঘনশ্যামের চরিত্র দীপ্তির মধ্য দিয়েই প্রকাশিত হয়েছে। বৈষ্ণব ধর্মের পরম ঔদার্য, ক্ষমাধর্ম, সারল্য, বাৎসল্য এসব কিছুর মহিমায় চরিত্রটি বাস্তব গ্রাহ্য পটভূমিতে বাস্তব জীবন সন্নিবদ্ধ মানবানুভূতির পরিচয় দিয়েছে। সম্পর্কের আন্তরিক মর্মস্পর্শিতা সৌদামিনীর প্রতি প্রকাশ করে তিনি যে মমত্বের পরিচয় দিয়েছেন, তাতে তিনি হয়ে উঠেছেন, যথার্থ বৈষ্ণবধর্মের যোগ্য উত্তরাধিকারী। শ্রীচৈতন্যদেব 'শিক্ষাষ্টক' গ্রন্থের তৃতীয় শ্লোকে বলেছেন, তৃণ থেকে ছোট হয়ে, তরুরূপী সহিষ্ণুতা অর্জন করে, নিরভিমানী চিত্তে সর্বজনকে সম্মান দিয়ে হরিনাম সংকীর্তন করলেই শ্রীকৃষ্ণের চরণস্পর্শ পাওয়া সম্ভব। ঘনশ্যামের চরিত্র মহিমা সেই বাণীর অনুরূপ প্রতিফলন, এ কথা অনস্বীকার্য।

বিশেষত যে ঔদার্যের মহানুভবতায় স্ত্রীর ব্যাভিচারিণী স্বভাবের পরও তাকে যে আন্তরিকতায় ঘনশ্যাম ক্ষমা করেছে, বৈষ্ণবতত্ত্ব দর্শনকে তিনি পুস্তকের বাণী থেকে বাস্তব প্রেক্ষাপটে জীবন্ত করেছেন এভাবেই। উপরন্তু স্বামীর উপযুক্ত সম্মান না পাওয়া সত্ত্বেও ঘনশ্যাম তাকে কখনো অমর্যাদা করেনি। নরেনের জীবহত্যা তাকে আহত করেছে একাধিকবার। জাগতিক নৃশংসতা থেকে মুক্তির আশায় তিনি তাই মহাপ্রভুর চরণাশ্রয়ী হয়েছেন বৈষ্ণব-রস গ্রন্থ পাঠের মধ্যদিয়ে। অন্তরের জ্ঞানকে শুধু পুঁথিগত বিদ্যার সমাহারেই তাকে সুসজ্জিত করেননি, বরং তাকে তিনি নিজ জীবনে প্রয়োগ করে, বৈষ্ণব ভক্তি ধর্মের মহানুভবতাকে চতুর্দিকে সঞ্চারিত করতে চেয়েছেন। চৈতন্যমূর্তির সম্মুখে ধ্যানরত ঘনশ্যাম শেষপর্যন্ত অন্তরের সুকোমল বৃত্তি লালিত হয়েই স্ত্রী সৌদামিনীকে আপন করে নিতে পেরেছেন। একটি পারিবারিক প্রেক্ষাপটে সরল অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার মধ্যে লেখক যে গভীর শুভবুদ্ধি সম্পন্ন জীবাত্মার উপস্থাপনা করেন, বৈষ্ণব ঘনশ্যামের মত বৃহৎ হৃদয়বত্তার অধিকারী পুরুষের মহানুভবতার উপস্থাপন করেছেন, তা যেন সত্যই ব্যতিক্রমী তথা নৈতিক বিবেকবান মানবসত্তার পরিচায়ক রূপে বিবেচিত হয়েছে। এই সহজ জীবনদর্শনকেই লেখক আলোচ্য গল্পে অত্যন্ত চমৎকার আবহে বৈষ্ণবীয় পরিমণ্ডলে ব্যক্ত করেছেন।

একাদশী বৈরাগী (১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দ):

মানব মনের এক অসংগতি ও অবরুদ্ধ পূর্ণ প্রতিবেশে রচিত কথাশিল্পী, শরৎচন্দ্রের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ রচনা 'একাদশী বৈরাগী'। গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় কার্তিক ১৩২৪ বঙ্গাব্দে। অসামান্য মানবিক আবেদনে গল্পটির পরিবেশিত হয়েছে। মানবতা ও প্রেমের মধ্যে শরৎচন্দ্র কাহিনীতে মানবতাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। কাহিনীর দিকে অগ্রসর হলে দেখা যায় চক্ষুলজ্জাহীন, সুদখোর, সুদ ছাড়া যার জীবনের একটি মুহূর্তও চলে না, সামান্যতম দানধর্মও যার কাছে অসম্ভব এমনই এক চরিত্র গল্পের মূল আলোচনায় উঠে এসেছে। চরিত্রটির নাম একাদশী, যে কিনা শেষ পর্যন্ত নিজের পদস্খলিতা বোনের প্রতি স্নেহ রসধারা বর্ষিত করে তাকে পরম অনুযোগহীন স্নেহে আগলে রেখেছেন। সেই সঙ্গে তার চরিত্রে ধরা পড়েছে বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা, প্রেম আত্মসমর্পণ। যিনি একই সঙ্গে নিচতা ও মহত্বের দুটি মাত্রাকে স্পর্শ করেছেন তার আন্তরিক বিবেকের সহায়তায়। নানা বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধিকারী একাদশী বৈরাগী চরিত্রটিকে নিয়ে শরৎচন্দ্র শিল্পীর সুতীক্ষ্ণ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে তাঁর চরিত্র মাহাত্ম্যে ও গল্পের পূর্ণাবয়ব গঠনে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

নিজ কুল পরিত্যাগ করে, অন্য কুলের ছেলের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কের সূত্রধরে একাদশীর বোন দোষী সাব্যস্ত হবার পর সে নিজের গ্রাম পরিত্যাগ করে অন্যত্র অর্থ উপার্জনকারী সুদের ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করে প্রতিষ্ঠিত হলেও তার কুৎসা দূরদূরান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। লেখক একাদশী বৈরাগী গল্পে এমনই এক মানবিক প্রতিমূর্তিকে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। যে পূর্ণ মানবিকতার দিকে থেকে ব্রাহ্মণ বিধবার টাকা বুঝিয়ে দিতে পেরেছেন, এমনকি নিজ বোনের হৃদয়প্রবৃত্তি, তার প্রেমের গতিকে অবরুদ্ধ না করে তাকে সমাদৃত করেছেন, যে সমাজে তাকে সমাজ বিরুদ্ধতার অভিযোগে অগ্রাহ্য করতে চেয়েছিল। সেই সমাজের মানুষের নিষেধ অমান্য করে অপূর্বর মত মানুষেরা পুনরায় বৈরাগী বাড়িতে চাঁদা তুলতে গিয়েছে। এ প্রসঙ্গে একাদশীর বোন গৌরীর চরিত্র মাহাত্ম্যও গল্পের গতিকে খানিক নিয়ন্ত্রিত করেছে।

''একাদশী সদ্‌গোপের ছেলে, জাত-বৈষ্ণব নহে। তাহার একমাত্র বৈমাত্রেয় ভগিনী প্রলোভনে পড়িয়া কুলের বাহির হইয়া গেলে, একাদশী অনেক দুঃখে তাকে অনুসন্ধানে তাহাকে ঘরে ফিরাইয়া আনে। কিন্তু এই কদাচারে গ্রামের লোক বিস্মিত ও অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ওঠে। ... একাদশী নিরুপায় হইয়া ভেক বৈষ্ণব হইয়া, এই বারুইপুরে পলাইয়া আসিল।''[৮৮]

গল্পে কালীদহ গ্রামটি ব্রাহ্মণ প্রধান, স্থান রূপেই চিহ্নিত হয়েছে। এখানে গোপাল মুখার্জির

ছেলে অপূর্ব কলকাতা থেকে বি.এ. পাশ করা যুবক। ছোট থেকেই এ গ্রামের মোড়ল রূপে পরিচিত ছিল। তিনি সনাতন হিন্দুধর্মের নিগূঢ় রহস্যের প্রতি তার শ্রদ্ধা পোষণ করে তার ব্যাখ্যা করেন। হিন্দু ধর্মের পুনরুদ্ধারে অপূর্ব ও তার সঙ্গীরা সন্ধ্যাহ্নিক, একাদশী, পূর্ণিমা, গঙ্গাস্নানের নিয়মে গ্রামের মহিলাদের সন্ত্রস্ত করে রেখেছিল। তাদের এই মাত্রাতিরিক্ত হিন্দুধর্ম ভক্তিতে এবং এর চর্চায় লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার দুঃসহ মানসিক নিপীড়নের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সকলের প্রাণ প্রায় ওষ্ঠাগত। চাঁদা সংগ্রহের জন্য অপূর্ব স্কুলের অদূরে পরিত্যক্ত, পোড়া ভিটার একাদশী বৈরাগীর বাড়ি উপস্থিত হয়। সে ষাটোর্ধ একজন বয়স্ক লোক। তার তেজারতির ব্যবসা। লেখক তার বর্ণনায় বলেছেন—

''সমস্ত দেহ যেমন শীর্ণ, তেমনি শুষ্ক। কণ্ঠ ভরা তুলসীর মালা। দাড়ি-গোঁফ কামান, মুখখানার প্রতি চাহিলে মনে হয় যে কোথাও ইহার লেশমাত্র রসকস আছে। ইক্ষু যেমন নিজের রস কলের পেষণে বাহির করিয়া দিয়া, অবশেষে নিজেই ইন্ধন হইয়া তাহাকে জ্বালাইয়া শুষ্ক করে, এ ব্যক্তি যেন তেমনি মানুষকে পুড়াইয়া শুষ্ক করিবার জন্যই নিজের সমস্ত মনুষ্যত্বকে নিঙড়াইয়া বিসর্জন দিয়া মহাজন হইয়া বসিয়া আছে।''[৮৯]

গ্রামের 'লাইব্রেরী'র জন্য চাঁদা চাইলে একাদশী নানান ভনিতায় তা দিতে অস্বীকৃত হয়। আট আনাতেই সে সকলকে সন্তুষ্ট থাকতে বলে এবং সকলের সঙ্গে বিনম্র ব্যবহারে তাদেরকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। জাতিতে সদগোপ হয়েও সে বৈষ্ণব ভেকধরে তার বোনের কলঙ্কের কারণে, ধোপা নাপিত, মুদি বন্ধ হওয়ায় বারুইপুরে চলে আসে। তার এই জড়ত্ব বোনের কলঙ্কজাত কারণে। পরবর্তীকালে নানা উদারতা ও হৃদয়াজাত দাক্ষিণ্যে চরিত্রটি আমাদের কাছে বৈষ্ণব ভাবাশ্রিত ভক্তপ্রাণ চরিত্র রূপেই বিশ্বাস যোগ্য হয়ে উঠেছে।

গল্পটিতে সনাতন হিন্দু ধর্মের মাত্রাতিরিক্ত ধর্মীয় নিয়মাবলীর অন্যতম একটি দিক 'একাদশী' পালন। যা অপূর্বের মত চরিত্রর বাহ্যিক আড়ম্বরের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। অনেক সনাতন হিন্দু বৈষ্ণবরা এই দিনটিকে বিষ্ণুর পূজার পরম পুণ্য তিথি রূপে চিহ্নিত করেন। বৈষ্ণব বিশ্বাস অনুযায়ী এই দিনটিতে উপবাস থাকলে মোক্ষলাভ অনিবার্য। গল্পে এই সকল নিয়মাচারের কঠোরতার মধ্য দিয়ে সনাতন বৈষ্ণবের কঠোরতা যেমন দৃশ্যমান হয়েছে, তেমনি ভেকধারী বৈষ্ণব 'একাদশী'র মতো চরিত্রের মধ্য দিয়ে মানবিকতার পরাকাষ্ঠায় ঈশ্বর প্রাপ্তির সহজ সরল দিকটিকে লেখক অতিমাত্রায় গুরুত্ব দিয়েছেন। একাদশী তার প্রেমের মধ্য দিয়েই ঈশ্বরের সেবক হতে চেয়েছেন। ধর্মের অন্ধত্ব থেকে কয়েক ক্রোশ দূরে সে নিজের ঔদার্য্যে, স্নেহে, আদর্শে, মানবিকতায় একজন

বৈরাগী হিসেবে একাদশীর স্নেহপূর্ণ দিকটিকেই সর্বশেষে প্রমাণিত করেছে। শরৎচন্দ্র এই চরিত্রটিতে এক প্রকার ত্যাগের মধ্য দিয়ে প্রাপ্তির আনন্দের দিকটিই ইঙ্গিতে বোধগম্য করতে চেয়েছেন। এই প্রাপ্তি চরম অনন্দময় সাধ্যবস্তুর প্রশান্তি যা বৈষ্ণবপদাবলীর 'সাধ্য-সাধন তত্ত্ব'-এ সাধ্যবস্তু প্রেমেরই নামান্তর, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

মামলার ফল (১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ):

গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'পার্বণী' পত্রিকার পূজা সংখ্যা ১৩২৫বঙ্গাব্দে। গল্পটিতে শরৎচন্দ্র স্নেহের বহু বিচিত্র আঙ্গিক তুলে ধরতে চেয়েছেন। ভাতৃবিরোধে দ্বিধাবিভক্ত পরিবারের একটি স্বল্প আবহে গভীর আন্তরিক দিক গল্প মধ্যে উঠে এসেছে। বড় ভাইয়ের স্ত্রীর স্নেহে লালিত পালিত ছোট ভাইয়ের ছেলে গঙ্গারাম, দুটি পরিবারের মধ্যে সংযোগ সেতু নির্মাণ করেছে। শিব ও শম্ভু দুই ভাইয়ের পারিবারিক বিবাদের মধ্যে শম্ভুর সন্তান গয়ারাম ও তার জ্যাঠাইমা গঙ্গামণির মধ্যেকার যে স্নেহের সম্পর্ক তার ইতিবৃত্তই এ গল্পের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। সামান্য বাঁশপাতার সূত্র ধরে দুই ভাইয়ের পারিবারিক কলহ গঙ্গামণি ও গয়ারামের মতো পুত্রসম সম্পর্কের অবনতি ঘটায়। পারিবারিক সম্পত্তির সূত্র ধরে তারা দুই ভাই তাদের সম্পর্ককে মামলা পর্যন্ত নিয়ে যায়। কিন্তু অন্তিমে দেখা যায় সকল জাগতিক বিতৃষ্ণাকে অতিক্রম করে দুই ভাইয়ের মামলা মিথ্যে দম্ভে পরিশ্রুত হয়ে নিমজ্জিত হয়েছে পরিবার প্রীতিতে। তারা দুই ভাই বাড়ি ফিরে দেখে গঙ্গামনি ও গয়ারাম তাদের মানবীয় প্রীতিকেই প্রাধান্য দিয়ে খুঁজে নিয়েছেন পরম শান্তির নীড়, যেখানে বাৎসল্য প্রেমের প্রবল গতিতে সাংসারিক জটিলতা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। তারা মিলিত হয়েছেন মাতা পুত্রের পরম স্নেহের সমুদ্রে।

এভাবেই শরৎচন্দ্র তাঁর 'রামের সুমতি', 'বিন্দুর ছেলে', 'মেজদিদি'র মত গল্পসমূহে স্নেহের বা বাৎসল্যের অপরূপ প্রতিমা নির্মাণ করে তাকে বৈষ্ণবীয় রসতত্ত্বে নিমজ্জিত করেছেন। আলোচ্য 'মামলার ফল' গল্পটিও তার ব্যতিক্রম নয়, তাইতো গঙ্গামণির অজস্র তাড়ন ভর্ৎসনা সত্ত্বেও গয়ারামের পুত্রসত্তা অনুভবের সুখ তাকে বেশিদিন পৃথক রাখতে পারেনি। বাৎসল্য ভক্তিরসে বালগোপাল যশোদা মাতাকে উত্তক্ত করলেও পরিশেষে তার মাতৃসত্তার জয় ঘোষিত হয়েছে—

''বাৎসল্য ভক্ত মাতা পিতা যত গুরুজন।
মমতা আধিক্যে তাড়ন ভৎর্সন ব্যবহার।।
... ...
মাতা মোকে পুত্র ভাবে করয়ে বন্ধন।

অতি হীন জ্ঞানে করে লালন পালন।।"[৯০]

পরিশেষে বলা যায়, তাড়ন, ভর্ৎসন, লালন বাৎসল্যের অপরিহার্য অঙ্গ হলেও বাৎসল্যে শান্তের নিষ্ঠা, দাস্যের সেবা, সখ্যের সংকোচহীনতা সকলগুণ বিদ্যমান থাকায় গঙ্গামণি ও গয়ারামের তির্যক স্নেহের সম্পর্কের মাঝে বৈষ্ণবরসতত্ত্বের বাৎসল্য প্রেমের মধুর পরিণতি দেখতে পাওয়া যায়।

অভাগীর স্বর্গ (১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দ) :

শরৎচন্দ্রীয় গদ্যের আকাশে স্নিগ্ধ সমবেদনার সমাজ চেতনায় অনুরঞ্জিত এক মর্মান্তিক পরিণতির অভাবনীয় সৃষ্টি 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পটি। গল্পটি সর্বপ্রথম 'বঙ্গবাণী' পত্রিকার আশ্বিন সংখ্যা ১৩২৯ বঙ্গাব্দে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। নারী হৃদয়ের আন্তরিক ইচ্ছা, তার অব্যক্ত বেদনার সুচারু শিল্পরূপ শরৎচন্দ্র যে চিত্রকল্প সহ উপস্থাপন করেছেন, তা নিঃসন্দেহে গল্পটিতে যুক্ত করেছে ভিন্ন মাত্রার স্বাদ। গল্পটিতে দুটি চিত্রনাট্যকে সমান্তরাল স্রোতে অবগহিত হতে দেখা যায়। প্রথাটিতে বাউড়ির মেয়ে কাঙালীর মা ব্রাহ্মণ জমিদার-গৃহিণীর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার সমারোহে মুগ্ধ চিত্তে ঐরূপ অন্তিম যাত্রা কামনা করেছে। তার এই অন্তিম যাত্রার স্বপ্ন সে মৃত্যুকালে তার পুত্রের সন্নিকটে বিবৃত করে। উচ্চবর্ণসুলভ সৎকার বিধি পালনের নির্দেশ দিয়ে যান। কিন্তু চূড়ান্ত দারিদ্রতা এবং জমিদারী ব্যবস্থার নিষ্ঠুর হৃদয়হীনতা, যান্ত্রিকতা ও কুসংস্কারের কারণে বাঙালীর মায়ের সেই অন্তিম স্বপ্ন সফল হয়না। তার মায়ের প্রজ্জ্বলিত চিতার অগ্নিকুণ্ড থেকেই সে তার মায়ের স্বর্গারোহণের স্বপ্নকে কল্পনায় রূপ দেয়, নিষ্ঠুর সামাজিক অভিঘাতে বাস্তবে তার সে স্বপ্ন পূরণের পথ খুঁজে পায় না।

এই আর্তধ্বনি এখানে বৈষ্ণবীয় স্নেহ আকুলতার প্রতিচ্ছবির সঙ্গে সমভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ। কারণ শরৎচন্দ্র রমণীর চিত্তবৃত্তিকে বাৎসল্যের পরাকাষ্ঠায় অঙ্কিত করেই উপস্থাপিত করেছেন। এখানেই তার বিশেষত্ব, সামান্য ঝলকে বৈষ্ণবীয় স্নেহবাৎসল্যের সরল গতিতে গল্পটি হয়ে উঠেছে অভাবনীয়।

সতী (১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দ):

হিন্দু রীতি-নীতির এক বিপরীত প্রতিচ্ছবি আলোচ্য 'সতী' গল্পের প্রকাশিত হতে দেখি। গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় আষাঢ় সংখ্যা ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে। গল্পটিতে নির্মলা নামক এক নারীর প্রবল সন্দেহ পরায়ণ স্বভাবের কারণে তাদের সংসারে অশান্তির আগুন বয়ে যায়। এই অবস্থায় তার স্বামী হরিশের সঙ্গে তার দাম্পত্য সমস্যার সূত্রপাত হয়। নির্মলার প্রতিটি

আচরণে ইতর, কদর্যপূর্ণ, কটুক্তিপূর্ণ বাক্যবাণ বর্ষিত হত। তার আক্রমণাত্মক শ্লেষে সর্বাঙ্গ বিদ্ধ অবস্থায় হরিশের জীবন হয়ে ওঠে দূর্বিষহ। এই বিধ্বস্ত পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পেতে তিনি এক শ্রীকৃষ্ণ প্রণয়িণী বৈষ্ণবীর আশ্রয় প্রার্থনা করে। এই হল গল্পের বহিরাঙ্গিক বর্ণনা, অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে দেখা যায় উভয়ের দাম্পত্য জীবনকেন্দ্রিক সমস্যার মূলে বিদ্যমান ধর্মগত পরিবেশ। ব্রাহ্ম কন্যা লাবণ্য ও সনাতনী ধর্মপন্থী হরিশ কোনভাবে হৃদয়তন্ত্রীতে এক সূত্রে আবদ্ধ হতে পারেনি, ফলে নির্মলাকে জীবন সঙ্গিনী নির্বাচন করে শান্তি পেতে চেয়েছেন হরিশ। অন্যদিকে আধুনিক লাবণ্য হরিশের বিবাহিত জীবনে কোন ভাবেই গলগ্রহ হয়ে আশ্রয় পেতে চাননি।

এদিকে মায়ের কাছ থেকে স্বামীকে নিয়ন্ত্রণ করার মন্ত্র নির্মলা প্রত্যহ হরিশের উপর প্রয়োগ করতে থাকে। তবুও স্ত্রীর সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়েই সে সংসারে সুখী থাকতে চেয়েছেন। স্বভাবতই তার পুরাতন প্রেমিকার কাছেও সে সনাতন হিন্দু ধর্মের উত্তরাধিকারীত্বের স্থান থেকে ফিরে যেতে চায়নি। হরিশের মনেও আর লাবণ্যের প্রতি প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টি যেমন জাগ্রত হয়নি, তেমনি লাবণ্যও নিজের কর্ম জীবনের সকল দায়িত্বকেই গুরুত্ব দিয়েছে। কিন্তু নির্মলা পাতিব্রাত্যের অধিক আগ্রহে স্বামীর প্রতি লাবণ্যকে কেন্দ্র করে সন্দেহ পোষণ করার ফলে অতিরিক্ত পতিধ্যানের মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়িতে অতিষ্ট হয়ে হরিশের বোন উমা তাকে দ্বিতীয় বিবাহের পরামর্শ দিলেও নির্মলার প্রতি তিনি বিমুখ হয়নি।

বজ্রবাসিনী রাধার মূর্তিতে নির্মিত লাবণ্যও তাই আপন চরিত্র মহিমা ও একনিষ্ঠতা বজায় রাখতে নিজেকে হরিশের থেকে আড়লেই রেখেছেন। বিরহিণীর তীব্র দহন জ্বালা সত্ত্বেও সে নিজেকে প্রকাশ্যে উন্মুক্ত করতে কুণ্ঠিত থেকেছেন। তাইতো গল্পকথক একটি স্থানে জানিয়েছেন যে লাবণ্য গ্রাম্য সমাজভুক্ত হওয়ায় বা নারীর স্বভাবসিদ্ধ শান্ত প্রকৃতির কারণেই হোক, নিশ্চুপ নিরবতার গভীর মেঘেই সে চিরদিন নিজেকে আচ্ছাদিত রেখেছে। তাইতো স্ত্রী ত্যাগের মত আত্মশক্তি অর্জন করে লাবণ্যের মত নারীর জীবনসঙ্গী হওয়াও হরিশের পক্ষে সম্ভব ছিল না। জীবনের এই ধ্রুবসত্য আনন্দ-বিরহের যাত্রাপথেই ঘনঘোর সন্ধ্যায় প্রতিবেশির বাড়ির দরজায় বৈষ্ণব ভিখারী দলের কীর্তন সংগীতে প্রতিধ্বনিত বিলাপের সুর তার জীবনের সুরের সঙ্গে মিলিত হয়েছে যা দূতীর কথায় স্পষ্ট প্রতিফলিত—

‘‘মথুরায় আসিয়া ব্রজনাথের হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতার কাহিনী বিনাইয়া বিনাইয়া নালিশ করিতেছে। সেকালে এ অভিযোগের কিরূপ উত্তর দূতীর মিলিয়াছিল হরিশ জানিত না, কিন্তু একালে সে ব্রজনাথের পক্ষে বিনা পয়সার উকিল দাঁড়াইয়া তর্কের উপর তর্ক জুড়িয়া মনে মনে

বলিতে লাগিল, ওগো দূতী, নারীর একনিষ্ঠ প্রেম খুব ভালো জিনিস, সংসারে তার তুলনা নেই। কিন্তু তুমি তো সব কথা বুঝবেও না— বললেও না। কিন্তু আমি জানি ব্রজনাথ কিসের ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন এবং একশ' বছরের মধ্যে আর ও-মুখো হননি, কংস-টংস সব মিছে কথা। আসল কথা শ্রীরাধার ওই একনিষ্ঠ প্রেম। ... মথুরায় লুকিয়ে থাকা চলত। কিন্তু একাল টের ঢের কঠিন! না আছে পালাবার জায়গা, না আছে মুখ দেখাবার স্থান। এমন ভুক্তভোগী ব্রজনাথ দয়া করে অধীনকে একটু শ্রীঘ্র পায়ে স্থান দিলেই বাঁচি।"[৯১]

এই দীর্ঘ উদ্ধৃতিটি ব্যবহারের বিশেষ তাৎপর্য বিদ্যমান। গল্পে বৈষ্ণবীয় তত্ত্বগত পরিমণ্ডল নির্মাণে মথুরার গোপীনাথের প্রসঙ্গ উদ্ধৃত করা হয়েছে। বলা হয়েছে ব্রজনাথ যখন বৃন্দাবন থেকে মথুরায় গমন করেন, তখন কংসবধ ছিল তার নিতান্তই বহিরাঙ্গিক কারণ। প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণ রাধার অতিরিক্ত প্রেমের ভাসমান স্রোতে পল্লবিত হতে চাননি। একনিষ্ঠপ্রেম নারীর বিশেষ অলংকার সম। তবুও তার নির্দিষ্ট গভীরতায় শ্রীকৃষ্ণ নিমজ্জিত হতে চাননি। সে কারণে কংসবধের হেতু তিনি মথুরায় গেলেও একশো বছরের আগে সেখান থেকে বৃন্দাবনে আসার কথাও ভাবেননি। প্রকৃতপক্ষে এই উক্তির তত্ত্বগত ভিত্তি কতটা সুদৃঢ় সে প্রসঙ্গে প্রশ্ন থেকেই যায়। তবুও আলোচ্য গল্পে হরিশের জীবন ও তার একনিষ্ঠ পতিপরায়ণা স্ত্রী নির্মলার অধিক স্নেহের ও অহেতুক সন্দেহ প্রবণতার গভীর ছায়াপাতে তিনি শ্রীকৃষ্ণের মতোই আত্মগোপন করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বর্তমান যুগ আর শ্রীকৃষ্ণের যুগের ন্যায় অত সুরক্ষিত নয়। সেকারণেই হরিশের আর কোনো পালাবার পথ নেই। স্ত্রীর অধিক প্রেমে সে অতিষ্ট হলেও তাকে ছেড়ে লাবণ্যের মত সর্বত্যাগিনী ও আধুনিকা দায়িত্বপরায়ণা নারীর সমগোত্রীয় তথা প্রেমিক হওয়ার মত আত্মবিশ্বাস তার ছিল না। সে কারণে বৈষ্ণবতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটের অনুসন্ধানে রাধাকৃষ্ণের প্রেমের মতই তাদের অর্থাৎ লাবণ্য ও হরিশের প্রেম, ভালোবাসা, মিলনের পথে পূর্ণতা পায়নি। কারণ মহৎ প্রেম সর্বদা কাছেই আনেনা, কখনো কখনো তা চিরবিরহের অন্তর্জালে দূরেও করে দেয়। সে কারণেই কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'সতী' গল্পটিতে সকল চরিত্র নানা সংগতি, অসংগতি নিয়ে তারা তাদের আভ্যন্তরীণ সতীত্ব রক্ষা করতে পেরেছেন। এমনকি গল্পের শেষে ব্রজনাথ ও রাধিকার প্রসঙ্গ কাহিনীতে সংযোজন করেছে চিরবিরহের মধুর রসের মহিমা। এভাবেই দাম্পত্য জীবনের অভ্যন্তরে বৈষ্ণব চেতনা সঞ্চারিত করে এমন নির্ভীক ভাবে, শ্রীকৃষ্ণের মত ভাগ্যবান চরিত্রকে তিনি আধুনিক দাম্পত্যের পঙ্কিলতম জটিল আবর্তে নিমজ্জিত করে, তাতে যুক্ত করেছেন মাথুরের পটভূমিকা। এমনকি পরিশেষে হরিশ যে নির্মলাকে ছেড়ে যেতে পারেনি তার অভ্যন্তরে নির্মলার প্রতি তার পত্নীপ্রেম

ও পরিণতির নির্মমতার চিন্তাই তাকে স্ত্রী ত্যাগের চিন্তা থেকে বিরত রেখেছে। এ প্রসঙ্গে কবি কালিদাস রায়ের 'পর্ণপুট'- কাব্যের একটি উক্তি উদ্ধৃত করছি—

''পাষাণ-কারার আকুল রোদন করেছে সুপ্ত তেজের বোধন
ভাঙিতে হয়েছে রাগের স্বপন ফাগের রঙীন ঘোর।
মিছে আর আঁখিজল।
মথুরার দূত করিয়া দিয়াছে অন্তর টলমল।''[৯২]

শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন ত্যাগের আরো একটি কারণ ছিল। তিনি শ্রীরাধার মধুর প্রেমে ঐশ্বর্যের ভাব অনুভব করেন, ফলে তিনি লীলাভূমি পরিত্যাগ করেন। কিন্তু হরিশ শেষপর্যন্ত জীবনের প্রত্যাশার পুনরায় গৃহমুখী হয়ে তাদের ছিদ্রপ্রায় দাম্পত্য জীবনের উপর নির্ভর করেই বাকী জীবন কাটাতে চেয়েছেন। পরিশেষে লাবণ্য হয়ে উঠেছেন বিরহিণী শ্রীরাধার সমতুল্য নারী।

পরেশ (১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দ):

গল্পটি শরৎচন্দ্র পরিণত বয়সে রচনা করলেও তাঁর পূর্ববর্তী প্লটগুলিরই পুনরাবৃত্তি ঘটিয়েছেন। গল্পটি প্রকাশিত হয় শরতের ফুল' পত্রিকায় পূজাবার্ষিকী সংখ্যা ১৩৩২ বঙ্গাব্দে। গল্পটিতে একজন আদর্শবান পুরুষ চরিত্র গুরুচরণ তার ভাইপো পরেশকে নিজ ব্যক্তিত্বের আদর্শে প্রতিপালিত করে। কিন্তু পরেশের নৈতিক শিক্ষা গুরুচরণের দেওয়া শিক্ষার একেবারেই বিপরীত রূপে প্রকাশিত হয়। সে জীবন প্রতিষ্ঠার মন্ত্রে কোথাও বা ব্রত চ্যুত হয়ে বারোয়ারী আমোদ, খেমটা নাচের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে। হরিচরণের পুত্র পরেশকে সন্তান স্নেহে আগলে রেখেছিলেন তার জ্যাঠামশাই। কিন্তু পরেশের কথোপকথনে সেই শালীনতা কোনদিনই প্রকাশিত হয়নি। বাৎসল্যের নির্মম প্রত্যাঘাতে গুরুচরণ প্রায় উন্মত্ত রূপে নিজের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষাকে পরিত্যাগ করেছে। মিথ্যে ষড়যন্ত্রের স্বীকার হয়ে যখন জ্যাঠামশাইকে সর্বস্ব খোয়াতে হয়, তখনো পরেশ তার স্নেহের মূল্য জ্যাঠামশাইকে দিতে পারেনি। পরিশেষে কাহিনীতে নানা উত্থান পতনের পর পিতার নানা অবিচারের প্রতিবাদে শেষপর্যন্ত পরেশ জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে কাশীযাত্রার মত দুঃসাহসিকতা দেখাতে পেরেছেন। বাৎসল্যের প্রতিদান স্বরূপ এটিই তার সর্বোৎকৃষ্ট প্রতিদান।

মাতা-পিতার সঙ্গে সন্তানের সেবা, নিষ্ঠা, মমত্ব গুণেই বাৎসল্যের সূচনা। আলোচ্য গল্পেও সেই বাৎসল্য প্রেমের প্রতিরূপ পরেশ অর্থাৎ গুরুচরণের ভাইপো, জ্যাঠামশায়ের স্নেহের সম্পর্কে পরিলক্ষিত হয়েছে। ভগবান কৃষ্ণ যে এমন বাৎসল্য গুণে নন্দের কাছে আশ্রয় নিয়েছিল, তার

স্নেহের পাত্র হয়েছিলেন, ঠিক তেমনি পরেশও যেন সেই রসেই জ্যাঠামশাইয়ের কাছে আপন মহিমায় বশ্যতা স্বীকার করেছে। ভাগবত ও পুরাণ গ্রন্থ 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত'-এ তাই বলা হয়েছে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর এই চারটি রসে ভক্ত কৃষ্ণ সন্নিকটে উপস্থিত হয়। শরৎচন্দ্র এইভাবেই গল্পমধ্যে বৈষ্ণবীয় রসতত্ত্বের বাৎসল্য রাগিণী অনুরণিত করেছেন পরেশ ও জ্যাঠামশাই গুরুচরণের মধ্য দিয়ে।

অন্তিমে একথাই বলা যায় 'মন্দির' গল্পে 'রাধাতত্ত্ব'-এর প্রতিরূপ অপর্ণা চরিত্রটিকে যেমন সমৃদ্ধ করেছে, তেমনি 'রামের সুমতি', 'বিন্দুর ছেলে' গল্পে মাতা যশোদার কৃষ্ণ বাৎসল্যের প্রতিচিত্র উত্থাপিত হয়েছে, 'পথনির্দেশ'-এ সনাতন হিন্দু ধর্ম ও ব্রাহ্ম ধর্মীয় রীতি-নীতিগত দ্বান্দ্বিক প্রেক্ষাপটে গুণেন্দ্র ও হেমনলিনীর সম্পর্কে বৈষ্ণবীয় 'প্রেমতত্ত্ব', 'মেঝদিদি' গল্পে বাৎসল্য রসের অভিনব মূর্ছনা, 'আঁধার আলো' কাহিনীতে বিদ্যাপতির পদের অবতারণায় সত্যেন্দ্রর উদ্দেশ্যে শ্রীমতি বিজলীর আত্মনিবেদনের আকূতি যে মর্মস্পর্শীতায় উপস্থাপিত হয়েছে তা নিঃসন্দেহে অভিনব। 'স্বামী' গল্পে চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবভাবনা কেন্দ্রিক জীবনাদর্শ সৌদামিনীর স্বামী ঘনশ্যাম আপনবক্ষে ধারণ করে স্ত্রীর চারিত্রিক পদস্খলনের পরও তাকে আপন অন্তরে স্থান দিয়ে উদার মহানুভবতাকে পরম ঔদার্যে প্রকাশিত করেছেন। 'একাদশী বৈরাগী'তে সহজিয়া জীবনচর্যার প্রতিফলন, সনাতন বৈষ্ণব ধর্মের কঠোর দিক, আচার সর্বস্বতাকে কাহিনী মধ্যে জীবন্ত রূপে উপস্থাপন করা হয়েছে। 'মামলার ফল' এও বাৎসল্যের অপরূপ মাতৃমহিমা, 'অভাগীর স্বর্গ'- এ বৈষ্ণবীয় ভক্তি আকুলতার পরোক্ষ আভাসে, 'সতী' গল্পে হরিশ নির্মলার দাম্পত্য সমস্যা, লাবণ্যের চরিত্র মহিমায় ব্রজবাসিনী রাধার মূর্তি, বিরহ কেন্দ্রিক অবয়বকে অপরূপ রসভাষ্য করে উপস্থাপন করা হয়েছে। 'পরেশ'-এ জ্যাঠামশাই ও পরেশের সম্পর্কে আভ্যন্তরীন প্রেক্ষাপটে নন্দ ও কৃষ্ণের স্নেহ, বাৎসল্যের প্রতিরূপকে যেভাবে লেখক শরৎচন্দ্র বাস্তবগ্রাহ্যতা দান করেছেন, তা নিঃসন্দেহে তাঁর ছোটগল্প সমূহকে বৈষ্ণবভানার প্রতিরূপ অন্বেষণে যথাযথ বিশ্বস্ততা প্রদান করেছে একথা দৃঢ়ভাবে বলা যায়। আধুনিক কথাসাহিত্যে ছোটগল্পকার রূপে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বৈষ্ণবীয় আঙ্গিকের সঙ্গে আধুনিক সমাজ প্রেক্ষাপটে, নরনারীর সম্পর্কের মর্মবস্তুকে যেভাবে মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে অভাবনীয় শিল্পকর্ম রূপেই পরিগণিত হয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১. শ্রী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'সুলভ শরৎসমগ্র-১', সুকুমার সেন (সম্পাদক), আনন্দ পাবলিশার্স প্রা:লি:, ৭৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম পেপারব্যাক সংস্করণ: জানুয়ারি ১৯৮৯, ষষ্ঠ মুদ্রণ: জুলাই ২০০৪, পৃ. ১৬৬৭

২. তদেব, পৃ. ৬

৩. তদেব, পৃ. ৬

৪. 'নব সংস্করণ বৈষ্ণব পদাবলী', অরুণ কুমার বসু ও মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), প্রজ্ঞাবিকাশ, ৯/৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-০৯, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ১৯৯৮, দ্বিতীয় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০১০, পৃ. ২৩২

৫. শ্রী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'সুলভ শরৎসমগ্র-১', সুকুমার সেন (সম্পাদক) আনন্দ পাবলিশার্স প্রা:লি:, ৭৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম পেপারব্যাক সংস্করণ: জানুয়ারি ১৯৮৯, ষষ্ঠ মুদ্রণ: জুলাই ২০০৪, পৃ. ২২

৬. 'নব সংস্করণ বৈষ্ণব পদাবলী', অরুণ কুমার বসু ও মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), প্রজ্ঞাবিকাশ, ৯/৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-০৯, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ১৯৯৮, দ্বিতীয় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০১০, পৃ.২২২

৭. শ্রী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'সুলভ শরৎসমগ্র-১', সুকুমার সেন (সম্পাদক), আনন্দ পাবলিশার্স প্রা:লি:, ৭৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম পেপারব্যাক সংস্করণ: জানুয়ারি ১৯৮৯, ষষ্ঠ মুদ্রণ: জুলাই ২০০৪, পৃ.২৩

৮. তদেব, পৃ. ২৩

৯. তদেব, পৃ. ২৮

১০. তদেব, পৃ. ২৯

১১. তদেব, পৃ. ৪০

১২. তদেব, পৃ. ৪০

১৩. তদেব, পৃ. ৪৬

১৪. তদেব, পৃ. ৫৫

১৫. তদেব, পৃ. ৯৪

১৬. তদেব, পৃ. ৯৪

১৭. ‘নব সংস্করণ বৈষ্ণব পদাবলী’, অরুণ কুমার বসু ও মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), প্রজ্ঞাবিকাশ, ৯/৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-০৯, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ১৯৯৮, দ্বিতীয় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০১০, পৃ.২০৩

১৮. শ্রী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ‘সুলভ শরৎসমগ্র-১’, সুকুমার সেন (সম্পাদক), আনন্দ পাবলিশার্স প্রা:লি:, ৭৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম পেপারব্যাক সংস্করণ: জানুয়ারি ১৯৮৯, ষষ্ঠ মুদ্রণ: জুলাই ২০০৪, পৃ. ৯৯

১৯. তদেব, পৃ. ১০২

২০. তদেব, পৃ. ১০৯

২১. ‘নব সংস্করণ বৈষ্ণব পদাবলী’, অরুণ কুমার বসু ও মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), প্রজ্ঞাবিকাশ, ৯/৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-০৯, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ১৯৯৮, দ্বিতীয় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০১০, পৃ.১৭৫

২২. শ্রী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ‘সুলভ শরৎসমগ্র-১’, সুকুমার সেন (সম্পাদক), আনন্দ পাবলিশার্স প্রা:লি:, ৭৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম পেপারব্যাক সংস্করণ: জানুয়ারি ১৯৮৯, ষষ্ঠ মুদ্রণ: জুলাই ২০০৪, পৃ.১০৯

২৩. তদেব, পৃ. ১৩৪

২৪. ‘নব সংস্করণ বৈষ্ণব পদাবলী’, অরুণ কুমার বসু ও মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), প্রজ্ঞাবিকাশ, ৯/৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-০৯, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ১৯৯৮, দ্বিতীয় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০১০, পৃ.২১০

২৫. শ্রী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ‘সুলভ শরৎসমগ্র-১’, সুকুমার সেন (সম্পাদক), আনন্দ পাবলিশার্স প্রা:লি:, ৭৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম পেপারব্যাক সংস্করণ: জানুয়ারি ১৯৮৯, ষষ্ঠ মুদ্রণ: জুলাই ২০০৪, পৃ.২৬৮

২৬. তদেব, পৃ. ২৭৬

২৭. ‘গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের ভূমিকা’, ড. সুখেন্দু সুন্দর গঙ্গোপাধ্যায়, সোনার তরী, ৪এ নর্থ নওদাপাড়া রোড, কলিকাতা-৫৭, প্রথম চলিত ভাষার পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, বইমেলা, জানুয়ারী ১৯৯৭, পৃ. ১৩১

২৮. ‘শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র’, মোহিতলাল মজুমদার, করুণা প্রকাশনী, ১৮ এ, টেমার লেন, কলকাতা-৯, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ১৯৯৮, দ্বিতীয় মুদ্রণ: ১লা বৈশাখ ১৪১৯, পৃ. ৬৩

২৯. শ্রী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'সুলভ শরৎসমগ্র-১', সুকুমার সেন (সম্পাদক), আনন্দ পাবলিশার্স প্রা:লি:, ৭৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম পেপারব্যাক সংস্করণ: জানুয়ারি ১৯৮৯, ষষ্ঠ মুদ্রণ: জুলাই ২০০৪, পৃ.২৮৫

৩০. তদেব, পৃ. ২৯২

৩১. 'শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র', মোহিতলাল মজুমদার, করুণা প্রকাশনী, ১৮ এ, টেমার লেন, কলকাতা-৯, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ১৯৯৮, দ্বিতীয় মুদ্রণ: ১লা বৈশাখ ১৪১৯, পৃ. ১২৩

৩২. শ্রী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'সুলভ শরৎসমগ্র-১', সুকুমার সেন (সম্পাদক), আনন্দ পাবলিশার্স প্রা:লি:, ৭৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম পেপারব্যাক সংস্করণ: জানুয়ারি ১৯৮৯, ষষ্ঠ মুদ্রণ: জুলাই ২০০৪, পৃ.৩১২

৩৩. 'নব সংস্করণ বৈষ্ণব পদাবলী', অরুণ কুমার বসু ও মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), প্রজ্ঞাবিকাশ, ৯/৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-০৯, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ১৯৯৮, দ্বিতীয় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০১০, পৃ.২৪২

৩৪. শ্রী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'সুলভ শরৎসমগ্র-১', সুকুমার সেন (সম্পাদক), আনন্দ পাবলিশার্স প্রা:লি:, ৭৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম পেপারব্যাক সংস্করণ: জানুয়ারি ১৯৮৯, ষষ্ঠ মুদ্রণ: জুলাই ২০০৪, পৃ.৩২৪

৩৫. তদেব, পৃ. ৩৩১

৩৬. 'নব সংস্করণ বৈষ্ণব পদাবলী', অরুণ কুমার বসু ও মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), প্রজ্ঞাবিকাশ, ৯/৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-০৯, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ১৯৯৮, দ্বিতীয় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০১০, পৃ.১৩৮

৩৭. তদেব, পৃ. ১৩৯

৩৮. শ্রী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'সুলভ শরৎসমগ্র-১', সুকুমার সেন (সম্পাদক), আনন্দ পাবলিশার্স প্রা:লি:, ৭৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম পেপারব্যাক সংস্করণ: জানুয়ারি ১৯৮৯, ষষ্ঠ মুদ্রণ: জুলাই ২০০৪, পৃ. ৩৩৯

৩৯. তদেব, পৃ. ৩৮৪

৪০. 'নব সংস্করণ বৈষ্ণব পদাবলী', অরুণ কুমার বসু ও মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), প্রজ্ঞাবিকাশ, ৯/৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-০৯, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ১৯৯৮, দ্বিতীয় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০১০, পৃ.১৪১

৪১. শ্রী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'সুলভ শরৎসমগ্র-২', সুকুমার সেন (সম্পাদক), আনন্দপাবলিশার্স প্রা:লি:, ৭৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম পেপারব্যাক সংস্করণ: জানুয়ারি ১৯৮৯, ষষ্ঠ মুদ্রণ: জুলাই ২০০৪, পৃ. ১১১২

৪২. তদেব, পৃ. ১১২৪

৪৩. তদেব, পৃ. ১১২৫

৪৪. তদেব, পৃ. ১১২৬

৪৫. তদেব, পৃ. ১১২৭

৪৬. তদেব, পৃ. ১১২৮

৪৭. তদেব, পৃ. ১১২৯

৪৮. শ্রী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'সুলভ শরৎসমগ্র-১', সুকুমার সেন (সম্পাদক), আনন্দপাবলিশার্স প্রা:লি:, ৭৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম পেপারব্যাক সংস্করণ: জানুয়ারি ১৯৮৯, ষষ্ঠ মুদ্রণ: জুলাই ২০০৪, পৃ. ৩৮৯

৪৯. তদেব, পৃ. ৪০০

৫০. তদেব, পৃ. ৪১০

৫১. তদেব, পৃ. ৪২৬

৫২. তদেব, পৃ. ৩৮৫

৫৩. তদেব, পৃ. ৪৫৯

৫৪. 'নব সংস্করণ বৈষ্ণব পদাবলী', অরুণ কুমার বসু ও মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), প্রজ্ঞাবিকাশ, ৯/৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-০৯, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ১৯৯৮, দ্বিতীয় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০১০, পৃ.১৮৩

৫৫. শ্রী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'সুলভ শরৎসমগ্র-১', সুকুমার সেন (সম্পাদক), আনন্দপাবলিশার্স প্রা:লি:, ৭৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম পেপারব্যাক সংস্করণ: জানুয়ারি ১৯৮৯, ষষ্ঠ মুদ্রণ: জুলাই ২০০৪, পৃ. ৪৬৪

৫৬. তদেব, পৃ. ৪৬৫

৫৭. তদেব, পৃ. ৪৬৭

৫৮. তদেব, পৃ. ৪৬৮

৫৯. তদেব, পৃ. ৪৬৮

৬০. তদেব, পৃ. ৪৬৯

৬১. তদেব, পৃ. ৪৭৩

৬২. তদেব, পৃ. ৪৭৩-৪৭৪

৬৩. 'শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র', মোহিতলাল মজুমদার, করুণা প্রকাশনী, ১৮ এ, টেমার লেন, কলকাতা-৯, দ্বিতীয় মুদ্রণ: ১লা বৈশাখ, ১৪০৯, পৃ. ১৮৯

৬৪. শ্রী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'সুলভ শরৎসমগ্র-১', সুকুমার সেন (সম্পাদক), আনন্দ পাবলিশার্স প্রা:লি:, ৭৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম পেপারব্যাক সংস্করণ: জানুয়ারি ১৯৮৯, ষষ্ঠ মুদ্রণ: জুলাই ২০০৪, পৃ. ৪৭৯

৬৫. তদেব, পৃ. ৪৭৯

৬৬. তদেব, পৃ. ৪৮১

৬৭. তদেব, পৃ. ৪৮১

৬৮. তদেব, পৃ. ৪৮১

৬৯. তদেব, পৃ. ৪৮৯

৭০. তদেব, পৃ. ৪৯৪

৭১. তদেব, পৃ. ৪৯৯

৭২. তদেব, পৃ. ৫০১

৭৩. তদেব, পৃ. ৫০৬

৭৪. তদেব, পৃ. ৫১১

৭৫. তদেব, পৃ. ৫১৬

৭৬. তদেব, পৃ. ৫২৩

৭৭. শ্রী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'সুলভ শরৎসমগ্র-২', সুকুমার সেন (সম্পাদক), আনন্দ পাবলিশার্স প্রা:লি:, ৭৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম পেপারব্যাক সংস্করণ: জানুয়ারি ১৯৮৯, ষষ্ঠ মুদ্রণ: জুলাই ২০০৪, পৃ.১৬৬৭

৭৮. তদেব, পৃ. ১৬৭৩

৭৯. তদেব, পৃ. ১৫৮৮

৮০. তদেব, পৃ. ১৫৯৩

৮১. তদেব, পৃ. ১৫৯৩

৮২. তদেব, পৃ. ১৬০৪

৮৩. তদেব, পৃ. ১৬১৭

৮৪. তদেব, পৃ. ১৬৩৪

৮৫. তদেব, পৃ. ১৬৩৭

৮৬. তদেব, পৃ. ১৬৪০

৮৭. 'স্বামী', শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, ২০৩/১/১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা, একাদশ সংস্করণ- ১লা বৈশাখ ১৩৪৯, পৃ. ৩২

৮৮. শ্রী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'সুলভ শরৎসমগ্র-১', সুকুমার সেন (সম্পাদক), আনন্দপাবলিশার্স প্রা:লি:, ৭৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম পেপারব্যাক সংস্করণ: জানুয়ারি ১৯৮৯, ষষ্ঠ মুদ্রণ: জুলাই ২০০৪, পৃ. ৭৮১

৮৯. তদেব, পৃ. ৭৮০

৯০. 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের ভূমিকা', ড. সুখেন্দু সুন্দর গঙ্গোপাধ্যায়, সোনার তরী, ৪এ নর্থ নওদাপাড়া রোড, কলিকাতা-৫৭, প্রথম চলিত ভাষার পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, বইমেলা, জানুয়ারী ১৯৯৭, পৃ. ১৩৯

৯১. শ্রী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'সুলভ শরৎসমগ্র-২', সুকুমার সেন (সম্পাদক), আনন্দপাবলিশার্স প্রা:লি:, ৭৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম পেপারব্যাক সংস্করণ: জানুয়ারি ১৯৮৯, ষষ্ঠ মুদ্রণ: জুলাই ২০০৪, পৃ.১৭৬০

৯২. 'পদাবলী সাহিত্য', শ্রীকালিদাস রায়, করুণা প্রকাশনী, ১৮এ টেমার লেন, কলকাতা-৯, প্রথমা করুণা সংস্করণ: আগস্ট ২০০৪, পৃ.১৪৫